ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

তৈরি পোশাক খাত:
সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়

৩১ অক্টোবর ২০১৩*

* ঈষৎ পরিমার্জিত সংস্করণ, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৩ (প্রথম প্রকাশ ৩১ অক্টোবর ২০১৩) ।

তৈরি পোশাক খাতঃ সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়
৩১ অক্টোবর, ২০১৩

গবেষণা উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ার, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগ, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা পরিকল্পণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
ড. সাদিদ আহমেদ নূরেমাওলা, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি (সাবেক)*
শরীফ আহমদ চৌধুরী, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
নাজমুল হুদা মিনা, *অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

সম্পাদনা ও পরিমার্জনা
শাহজাদা এম আকরাম *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
মো. ওয়াহিদ আলম *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

কৃতজ্ঞতা
গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে সহযোগিতা করেছেন গবেষণা শিক্ষানবিশ ইসরাত জাহান, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার নীনা শামসুন নাহার ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফারহানা রহমান। এছাড়া টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তারা মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাসা # ১৪১, রোড # ১২, ব্লক # ই
বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮-০২-৮৮২৬০৩৬, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

উৎসর্গ

তৈরি পোশাক খাতে দুর্ঘটনায়
হতাহত শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ব্রত নিয়ে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে। টিআইবি এমন একটি বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত এবং জনগণের সেবার জন্য কর্মরত সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম হবে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক।

দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টি এবং নাগরিকদের দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করার জন্য টিআইবি ২০০৯ সাল থেকে 'পরিবর্তন ড্রাইভিং চেঞ্জ' প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে জনস্বার্থে নিয়োজিত গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পথে অন্তরায় এমন বিষয়ে গবেষণা ও তার ভিত্তিতে সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও নীতি প্রণয়নে কার্যক্রম পরিচালনা করা।

সাম্প্রতিক তৈরি পোশাক খাতে নানা দুর্ঘটনা এ খাতের পেছনে জড়িত অনিয়ম ও দুর্নীতির সামষ্টিক ফল, যা সুশাসনের ব্যর্থতার প্রতিফলন। তৈরি পোশাক খাতে বিদ্যমান সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রকৃতি এবং ব্যাপকতা সম্পর্কে অনুসন্ধানকল্পে বিভিন্ন অংশীজনদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা এবং এ খাতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আইনের শাসন নিশ্চিতকল্পে সুপারিশমালা প্রদান করার জন্য গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়।

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক ড. সাদিদ আহমেদ নূরেমাওলা (সাবেক), শরীফ আহমেদ চৌধুরী ও নাজমুল হুদা মিনা। বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব কারখানার মালিক ও কর্মকর্তা, শ্রমিক, শ্রমিক নেতা, সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ কর্মকর্তা, কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষক, বায়ার প্রতিনিধি, গবেষক, আইনজীবী ও দেশি-বিদেশি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান তথ্য উপাত্ত দিয়ে গবেষণা কর্মটিকে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এছাড়া টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তারা মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল এই গবেষণা কর্মটির সার্বিক তত্ত্বাবধান করেছেন এবং প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। টিআইবি আশা করে এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য, বিশ্লেষণ ও সুপারিশসমূহ বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতে বিরাজমান সমস্যা সমাধানে দেশি-বিদেশি উদ্যোগে সহায়ক হবে এবং এ খাতকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করে তুলতে সাহায্য করবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের যে কোনো গবেষণা বা কর্মসূচিতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

এ প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে আপনাদের যে কোনো মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সূচিপত্র

মুখবন্ধ			৪
প্রথম অধ্যায়		ভূমিকা	
	১.১	প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা	৬
	১.২	গবেষণার উদ্দেশ্য	৮
	১.৩	গবেষণার আওতা	৮
	১.৪	গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য উৎস	৮
	১.৫	গবেষণার সীমাবদ্ধতা	৮
	১.৬	প্রতিবেদন কাঠামো	৮
দ্বিতীয় অধ্যায়		তৈরি পোশাক খাতের আইনি কাঠামো	
	২.১	বাংলাদেশ শ্রম আইনের ক্রমবিকাশ	১০
	২.২	‘বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৩’- কিছু পর্যবেক্ষণ	১০
	২.৩	উপসংহার	১২
তৃতীয় অধ্যায়		তৈরি পোশাক খাত-সংশ্লিষ্ট অংশীজন: সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	
	৩.১	কারখানা মালিক	১৪
	৩.২	মালিক সংগঠন (বিজিএমইএ)	১৮
	৩.৩	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর	২১
	৩.৪	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)	২৫
	৩.৫	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা)	২৭
	৩.৬	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	২৭
	৩.৭	শ্রমিক সংগঠন (ট্রেড ইউনিয়ন) ও শ্রম পরিদপ্তর	২৯
	৩.৮	বায়ার	৩৩
	৩.৯	কারখানা প্রতিষ্ঠায় নিয়ম বহির্ভূত অর্থ আদায়	৩৫
	৩.১০	উপসংহার	৩৬
চতুর্থ অধ্যায়		তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব বিশ্লেষণ	৩৭
পঞ্চম অধ্যায়		উপসংহার ও সুপারিশ	৪১
তথ্যসূত্র			৪৪
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী			৪৭
পরিশিষ্ট-১		ভিয়েতনাম শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম আইন এর তুলনামূলক পর্যালোচনা	৪৮
সারণি তালিকা			
সারণি ১		তৈরি পোশাক খাত সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান	১৩
সারণি ২		নির্মাণ নকশা অনুমোদনে রাজউক কর্তৃক আটটি পর্যায়ে নিয়ম বহির্ভূত অর্থ আদায়ের পরিমাণ	২৬
সারণি ৩		কারখানা প্রতিষ্ঠায় নিয়ম বহির্ভূত অর্থ আদায়	৩৬
চিত্র ১		তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব বিশ্লেষণ	৪০

অধ্যায় এক

ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তৈরি পোশাক খাতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতা-পরবর্তী আশির দশক হতে তৈরি পোশাক শিল্প দেশীয় অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনে (ভট্টাচার্য ও রহমান, ১৯৯৯)। মূলত আশির দশকে আমদানিকারক উন্নত দেশগুলোর আরোপিত কোটা পদ্ধতির বিলুপ্তি এবং শ্রমমূল্যের বৃদ্ধির ফলে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে এ শিল্পের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয় এবং বাংলাদেশে এ শিল্পের নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় (রশিদ, ২০০৬)। নব্বইয়ের দশক থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাহক হিসেবে এ খাত বাংলাদেশের ক্রমবিকাশমান রপ্তানিতে সর্বাধিক ভূমিকা পালন করছে (বজলুল ও নাজনীন, ২০০৬)। ১৯৮২-৮৩ অর্থবছরে দেশের মোট রপ্তানিতে এ খাতের অংশ ছিল ১.১%, যা ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ৭৯.৬৩%-এ এসে দাঁড়িয়েছে। জিডিপিতে এ খাতের অবদান প্রায় ১০% (মাহমুদ, ২০১২) এবং সম্পূরক শিল্প মিলে প্রায় ১৪-১৫%[১]। ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ খাত হতে রপ্তানি আয় ছিল ২১.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার[২]। তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক হিসেবে বিশ্বে বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়[৩]।

তৈরি পোশাক খাত প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতিতে সবচেয়ে বড় কর্ম-সংস্থানকারী[৪] এবং দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবে বিবেচিত। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশে তৈরি পোশাক কারখানার সংখ্যা ছিল মাত্র ৫০টি এবং কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল কয়েক হাজার (কবির ও মাহমুদ, ২০০৪)। বর্তমানে বাংলাদেশে ৫,৪০০টি তৈরি পোশাক কারখানা রয়েছে, যেখানে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ[৫], যাদের প্রায় ৮৫% নারী (মাহমুদ, ২০১২)। এ কারণে তৈরি পোশাক শিল্পকে এককভাবে নারীদের সবচেয়ে বড় কর্মসংস্থানকারী বলা হয়। গ্রামীণ নিম্ন আয়ের পরিবার থেকে আসা অধিকাংশ নারী শ্রমিকের কর্মসংস্থান তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করেছে (ফৌজিয়া, ২০০৬)। মূলত সরকারের বিভিন্ন সহায়ক নীতি-সুবিধা ও দেশীয় নীতির ইতিবাচক পরিবর্তন এ খাতের দ্রুত বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে (মোরশেদ,২০০৭)। এ সময় সরকার আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ও বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে মুক্তবাজার অর্থনীতি সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে তৈরি পোশাক খাতে বেসরকারি বাণিজ্যিক লেনদেনের জন্য অর্থনীতি মুক্তকরণ, বৈদেশিক বিনিয়োগের বাধা কমিয়ে আনা, আমদানি শুল্ক কমানো এবং উদ্যোক্তাদের জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় (রশিদ, ২০০০), যা রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক উৎপাদনকে অনুপ্রাণিত করে (রাবিনওয়াজ ও গিডেন ২০০৬)। ১৯৮২ সালের জুন মাসে সরকার কর্তৃক ঘোষিত নতুন শিল্প নীতি (New Industrial Policy- NIP) শিল্পক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নীতি সংস্কারে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এ সময় সরকার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি শুল্কমুক্ত আমদানির সুবিধা প্রদান করে, ফলে কারখানার সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে (কুদ্দুস, মুনির ও সেলিম, ২০০০)। ১৯৮৬ সালে এনআইপি (NIP) সংশোধনের ফলে বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে শিল্প উন্নয়ন ও বাজার সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া আরো ত্বরান্বিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে গ্রহণকৃত শিল্প নীতিতেও পূর্ববর্তী নীতির উদ্দেশ্য বজায় রাখা হয় এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজার অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য সরকার বিভিন্ন প্রণোদনামূলক[৬] সুবিধা প্রদান করে (আহমেদ ও হোসেন, ২০০৬)। এ ছাড়া সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment) উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (Export Processing Zone-EPZ) তৈরি করা হয় (ভট্টাচার্য ও রহমান, ১৯৯৯)। কার্যত সব সরকারের ধারাবাহিক সহযোগিতামূলক নীতি তৈরি পোশাক খাতের ব্যবসা সম্প্রসারণে মূল ভূমিকা রেখেছে।

তবে তৈরি পোশাক খাতের অর্থনৈতিক সাফল্য এ খাতের সামগ্রিক চিত্র প্রকাশ করে না। সরকার কর্তৃক বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনা ও নীতি-সুবিধা প্রদান করা হলেও এ খাতের মূল চালিকাশক্তি শ্রমিকের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়নি। কারখানার

---

[১] দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ১০ জুন, ২০১৩।

[২] www.epb.gov.bd

[৩] www.bgmea.com.bd, accessed on 8 July 2013.

[৪] ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ৮ জুলাই ২০১২।

[৫] www.bgmea.com.bd

[৬] প্রণোদনামূলক নীতি সুবিধার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- আমদানি সহজসাধ্য করা ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এড়ানোর জন্য বন্ডেড ওয়ারহাউজের সুবিধা প্রদান, শুল্কমুক্ত আমদানি সুবিধা, কর অবকাশ, নগদ অর্থ সহায়তা (চলতি বছরে ৫% হারে নগদ সহায়তা প্রদান), আয়কর রেয়াতিকরণ সুবিধা, নিম্ন সুদে ঋণ প্রদান, ব্যাক টু ব্যাক লেটার অব ক্রেডিটের আওতায় আমদানি (১৩% সুদ যা অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ১৭-১৮%), রপ্তানি আমানত প্রত্যাভূতিপত্র পদ্ধতি, রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) থেকে ৩ শতাংশ হারে ঋণ সুবিধা, ডাউন পেমেন্ট ছাড়া খেলাপি ঋণ পুনঃতফসিল, ১ শতাংশ শুল্কে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি (অন্যান্য খাতে তা ৩ শতাংশ) ইত্যাদি।

অস্বাস্থ্যকর কর্ম-পরিবেশ ও সোশ্যাল কমপ্লায়েন্সের[৭] ঘাটতি এ অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করছে (আহমেদ, ২০১১)। কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটির (Corporate Social Responsibility) এক প্রতিবেদনে দেখা যায় বাংলাদেশে মাত্র ৫০-১০০ তৈরি পোশাক কারখানা সর্বোচ্চ মানদণ্ড বজায় রাখতে পারছে (ম্যাককিনসি অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১২)। এ ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে শ্রমিকদের শিক্ষার অভাব, আইনের কার্যকর প্রয়োগের অভাব, প্রতিষ্ঠানগুলোর অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রবণতাকে চিহ্নিত করা হয়। শ্রমিকের অধিকার সংরক্ষণ ও যৌথ দরকষাকষির জন্য ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু, বাংলাদেশে তৈরি পোশাক কারখানাগুলোতে প্রায়ই শ্রমিক অধিকার লঙ্ঘন করা হয় বলে একটি ধারণা দেশে ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত রয়েছে। বাংলাদেশের শিল্প-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে আইনানুসারে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের বিধান থাকলেও বিভিন্ন বাধ্যবাধকতা, প্রশাসনিক জটিলতা ও উদ্যোক্তাদের নেতিবাচক মনোভাব ট্রেড ইউনিয়ন গঠনকে বাধাগ্রস্ত করে (তামান্না, ২০১০ ও আবসার, ২০০১)।

আইএলও–র এক প্রতিবেদনে বলা হয়, শ্রমিকদের প্রতি তৈরি পোশাক কারখানা[৮] ব্যবস্থাপকদের বিভিন্ন নিপীড়নমূলক মনোভাব ও শ্রমিকদের অসচেতনতা ট্রেড ইউনিয়নের বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে, যা আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ড ও ব্যবহারবিধিকে লঙ্ঘন করে (আইএলও, ২০০৩)।

অপরদিকে, তৈরি পোশাক খাত শুরুর দিক থেকেই দুর্নীতির মুখোমুখি হচ্ছে এবং বিভিন্নভাবে এ খাতে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে। অনেকের মতে বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পের ক্রমবিকাশের সাথে সাথে আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতির বিস্তার লাভ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম ও দুর্নীতি জাতীয় অর্থনীতিতে এ খাতের অবদানের সম্ভাবনাকে ব্যাহত করেছে (কুদ্দুস, ২০০০)। ম্যাককিনসি অ্যান্ড কোম্পানির জরিপে (২০১২) দুর্নীতিকে তৈরি পোশাক শিল্পের উন্নয়নে অন্যতম ঝুঁকি (Risk Factor) হিসেবে দেখানো হয়। বিশ্বব্যাংকের (২০০২) গবেষণা অনুযায়ী দুর্নীতি দূর করা গেলে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন শতকরা আরও ২ ভাগ বৃদ্ধি সম্ভব। মূলত তৈরি পোশাক খাতে সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির মিথস্ক্রিয়া অধিক মুনাফা অর্জনের প্রবণতা তৈরি করে এবং শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। সহজ উপায়ে ব্যবসা সম্প্রসারণ বা শুরু করার জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার এবং আইন ভঙ্গ করার মাধ্যমে যত্রতত্র কাঠামো নির্মাণ, বিপজ্জনক এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কারখানা পরিচালনা করা হয় যা বড় ধরনের দুর্ঘটনার দীর্ঘমেয়াদি ফাঁদ তৈরি করতে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। স্পেকট্রাম, তাজরিন ও সাম্প্রতিক সময়ের রানা প্লাজা, আসওয়াদ কম্পোজিট এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সামষ্টিক অর্থনীতিতে যার প্রভাব আরও অনেক ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। সর্বোপরি, দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড বলে খ্যাত তৈরি পোশাক শিল্পের বিপর্যয়ের ঝুঁকি সৃষ্টি হতে পারে।

কমপ্লায়েন্স ঘাটতি, অনিরাপদ কর্ম-পরিবেশ ও শ্রমিক অধিকার বিষয়ে নানা অভিযোগ সত্ত্বেও বাংলাদেশে মানসম্মত কর্ম-পরিবেশ বজায় রাখে এমন বেশ কিছু পোশাক কারখানা রয়েছে। শিশুশ্রম মুক্ত এসব কারখানায় বেশ কিছু ভাল চর্চা পরিলক্ষিত হয়, যা অনুসরণীয়। ইউএনডিপির গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি ইনিশিয়েটিভের অ্যাডভাইজারি বোর্ডের সদস্য একটি তৈরি পোশাক কারখানা বাংলাদেশে অবস্থিত এবং পরিবেশগত মানের দিক দিয়ে ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলের (ইউএসজিবিসি) সেরা তিনটি কারখানার একটি বাংলাদেশে অবস্থিত।[৯] এছাড়া কয়েকটি কারখানায় নিম্নতম মজুরির থেকেও বেশি মজুরি ও সুবিধা (যেমন- যাতায়াত ভাতা) প্রদান, ২০০৮ সালের পর থেকে বেশ কয়েকটি কারখানা শ্রমিকদের ন্যায্য ও কম মূল্যে পণ্য সুবিধা দেওয়ার জন্য দোকান প্রতিষ্ঠা, নারী কর্মীদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন ভর্তুকি প্রদান এবং সন্তান-সম্ভবা কর্মীর পুষ্টি নিশ্চিত করতে দৈনিক ভাতা প্রদান, নিজস্ব স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পেশাগত ঝুঁকি পরীক্ষা, কয়েকটি কারখানায় প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া কয়েকটি কারখানায় নিজস্ব আবাসন ও স্কুল সুবিধা, দুপুরের খাবার ও টিফিন সরবরাহ, বিনোদন ও যাতায়াতের জন্য পরিবহন সুবিধা রয়েছে।

কিন্তু সাম্প্রতিক বিভিন্ন দুর্ঘটনা, সহস্রাধিক শ্রমিকের মৃত্যু ও পঙ্গুত্ব বরণ, শ্রমিক অসন্তোষ ও অস্থিরতা, বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের বিভিন্ন নেতিবাচক অবস্থা, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক জিএসপি সুবিধা বাতিল, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক জিএসপি বাতিলের হুমকি অথবা সাধারণ ক্রেতাদের বাংলাদেশি পণ্য বর্জনের আন্দোলন ইত্যাদির সম্মুখীন করছে। এ অবস্থায় প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা এবং তৈরি পোশাক খাতকে টেকসই করার জন্য দুর্নীতি-সংক্রান্ত ব্যয় কমানো এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। তৈরি পোশাক খাতের চ্যালেঞ্জ, সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স এবং ভবিষ্যৎ অগ্রযাত্রা সম্পর্কে অনেক গবেষণা হলেও এ খাতের সুশাসন ও দুর্নীতি সম্পর্কে গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

---

[৭] তৈরি পোশাক শিল্পে কমপ্লায়েন্স বলতে সাধারণভাবে বোঝানো হয় কিছু বিষয়ে নির্দিষ্ট মান বজায় রাখা, যেমন মানসম্পন্ন কারখানা স্থাপনা, কর্ম-পরিবেশ, শ্রমিক অধিকার, শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তামূলক উদ্যোগ ও পরিবেশগত নিরাপত্তা।

[৮] তৈরি পোশাক কারখানা বলতে যেসব রপ্তানিমুখী কারখানায় finished goods (যেমন শার্ট, টি-শার্ট, ট্রাউজার ইত্যাদি) প্রস্তুত করা হয় তাদের বোঝানো হয়েছে।

[৯] *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ঢাকা, ১ জুলাই, ২০১৩; বিস্তারিত দেখুন- http://www.usgbc.org/ ও www.greenindustryplatform.org

কর্তৃক সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পরিচালিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায় চিহ্নিত করার জন্য এ গবেষণা পরিচালনা করেছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা এবং তা দূরীকরণে সুপারিশ প্রদান করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে

১. তৈরি পোশাক খাতের সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি কাঠামো পর্যালোচনা করা
২. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা পর্যালোচনা করা
৩. তৈরি পোশাক খাতে প্রায়োগিক প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রকৃতি, ক্ষেত্র ও প্রভাব চিহ্নিত করা, এবং
৪. চিহ্নিত সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করা।

১.৩ গবেষণার আওতা

গবেষণার আওতাভুক্ত বিষয়ের মধ্যে রয়েছে:

- গবেষণায় তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের বিভিন্ন নির্দেশকের (আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ, সংবেদনশীলতা) ওপর ভিত্তি করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা ।
- তৈরি পোশাক খাত-সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি কাঠামো পর্যালোচনা।
- তৈরি পোশাক খাতের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পর্যালোচনা - তৈরি পোশাক কারখানা ব্যবসা পরিচালনা, তদারকি, বিভিন্ন সেবা সুবিধা প্রদান ও স্বার্থ রক্ষার্থে ১৭টি সরকারি ও একটি বেসরকারি সংস্থা (বিজিএমইএ), শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠন এবং বায়ারসহ বিভিন্ন অংশীজন এ খাতের বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত। জড়িত অংশীজনের মধ্যে গুরুত্ব বিবেচনায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, রাজউক, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, কারখানা মালিক ও মালিক সংগঠন (বিজিএমইএ), শ্রমিক সংগঠন (ট্রেড ইউনিয়ন) এবং বায়ার এ গবেষণায় আওতাভুক্ত। এ সকল অংশীজনের শুধুমাত্র তৈরি পোশাক খাত-সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- তৈরি পোশাক খাতে বিভিন্ন পর্যায়ে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে দুর্নীতি ও অনিয়মের ধরন, শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার ও কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত বিষয় গবেষণার আওতাভুক্ত।

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য উৎস

এ গবেষণায় গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। চেক লিস্টের মাধ্যমে তৈরি পোশাক খাত-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। মুখ্যতথ্যদাতা হিসেবে ছিলেন কারখানা মালিক ও কর্মকর্তা, শ্রমিক, শ্রমিক নেতা, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ কর্মকর্তা-কর্মচারী, কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষক, বায়ার প্রতিনিধি, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, গবেষক ও আইনজীবী। এছাড়া খাত-সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা, আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সনদ, সরকারি প্রতিবেদন, আদালতের রায়, গবেষণা প্রতিবেদন, বই, প্রবন্ধ, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত খবর ও প্রবন্ধ ও ওয়েবসাইট ইত্যাদি পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

১.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

- এটি একটি গুনগত গবেষণা, প্রাপ্ত তথ্যসমূহ দৈবচয়নভিত্তিক জরিপ প্রাপ্ত নয়, সুতারাং কোন সাধারণীকরণ করা হয়নি। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্যসমূহ এ খাতে বিদ্যমান দুর্নীতি ও অনিয়ম সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করে। সময় ও সম্পদের স্বল্পতা এবং পরিধির ব্যাপকতার কারণে তৈরি পোশাক খাতের সাথে জড়িত সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি।
- বিজিএমইএ'র নিকট হতে কাঙ্ক্ষিত সহযোগিতা না পাওয়ার কারণে বিজিএমইএ'র ভূমিকা আরও সুস্পষ্টভাবে তুলে আনা যায়নি।
- তাজরিন ও রানা প্লাজার দুর্ঘটনা-পরবর্তী সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশ না করার কারণে এ সংক্রান্ত তথ্যের জন্য দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে।
- দুর্নীতি সংক্রান্ত ঘটনায় উভয় পক্ষ লাভবান হওয়ায় সকল ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেনের প্রকৃত পরিমাণ জানা সম্ভব হয়নি, তবে আনুমানিক পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা লাভ সম্ভব হয়েছে।

১.৬ প্রতিবেদনের কাঠামো

গবেষণা প্রতিবেদনটি মোট পাঁচটি অধ্যায়ে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা, গবেষণার উদ্দেশ্য, পরিধি, গবেষণা পদ্ধতি ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩' পর্যালোচনা করে উক্ত আইনের বর্তমান সংশোধনের ইতিবাচক দিকগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে এবং বিদ্যমান আইনের

বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা নির্ণয় করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে তৈরি পোশাক খাতে জড়িত অংশীজনদের চিহ্নিত করে এদের মধ্য থেকে গুরুত্ব বিবেচনায় সরকারি অংশীজনের ১৭টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে এবং কারখানা মালিক ও মালিক সংগঠন (বিজিএমইএ), শ্রমিক সংগঠন (ট্রেড ইউনিয়ন) এবং বায়ারসহ মোট আটটি অংশীজনের এ খাতে বিদ্যমান সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রকৃতি, ক্ষেত্র ও প্রভাব উদ্‌ঘাটন পূর্বক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে। সর্বশেষ পঞ্চম অধ্যায়ে উপসংহার এবং গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে।

অধ্যায় দুই

তৈরি পোশাক খাতের আইনি কাঠামো

তৈরি পোশাক খাতে শ্রমিকের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলি, মজুরি, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, শ্রমিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থা, সংগঠন করার অধিকার, কর্ম-পরিবেশ, কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থাপনা, দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণ, বিরোধ নিষ্পত্তি ইত্যাদি বিষয়গুলো 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৩'[১]-এর আওতাভুক্ত। এ প্রেক্ষাপটে উক্ত আইনটি এ অধ্যায়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২.১ বাংলাদেশ শ্রম আইনের ক্রমবিকাশ

১৮৮১ সালে উপমহাদেশে প্রথম শ্রম আইন প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার শ্রমিক সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আইন প্রণয়ন করে, যেমন কারখানা আইন (১৮৮১), শ্রমজীবী ক্ষতিপূরণ আইন (১৯২৩), ট্রেড ইউনিয়ন আইন (১৯২৬), বাণিজ্য দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তি আইন (১৯২৯), মজুরি প্রদান আইন (১৯২৬), মাতৃকল্যাণ আইন (১৯৩৯) ও শিশু কর্মসংস্থান আইন (১৯৩৮), ইত্যাদি। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্তির পর এসব আইনের বিভিন্ন সংশোধন করা হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকার পূর্ববর্তী আইনগুলো বজায় রাখে[১০] এবং পরিবর্তিত দেশীয় অবস্থা ও শ্রমিক শ্রেণির প্রয়োজনীয়তায় সরকার আরও কিছু আইন প্রণয়ন করে। সরকার এ সংক্রান্ত বিদ্যমান ২৫টি আইনকে সংশোধন ও সংহতকরণ করে 'বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬' প্রণয়ন করে। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চাকুরিতে নিযুক্ত কর্মচারীদের নিজস্ব ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের বিধান করে আইন সংশোধন করা হয়[১১] এবং ২০১০ সালে শ্রমিকের অবসরের বয়স সীমা ৫৭ বছর থেকে বৃদ্ধি করে ৬০ বছর করে পুনরায় আইনটি সংশোধন করা হয়[১২]। সাম্প্রতিক সময়ে তাজরিন ফ্যাশন অগ্নিকাণ্ড ও রানা প্লাজা ধসের প্রেক্ষিতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাপে সরকার ২০১৩ সালের ২২ জুলাই পুনরায় আইনটি সংশোধন করে।

২.২ 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৩'- কিছু পর্যবেক্ষণ

শ্রমিক নিয়োগ, মালিক-শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্ক, সর্বনিম্ন মজুরি হার নির্ধারণ, কার্যকালে দুর্ঘটনাজনিত কারণে জখমে শ্রমিকের জন্য ক্ষতিপূরণ, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, শিল্প বিরোধ উত্থাপন ও নিষ্পত্তি, শ্রমিকের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কল্যাণ ও চাকুরির অবস্থা ও পরিবেশ, শ্রম আদালত ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে উক্ত আইনে বিধান রয়েছে। আইনের সংশোধনের ধারাবাহিকতা ও সাম্প্রতিক বিভিন্ন দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে শ্রমিক অধিকার ও কল্যাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সংশোধনীতে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়-

- **ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে শ্রমিকের তালিকা মালিক পক্ষকে না দেওয়া:** পূর্বে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের আবেদনের কপি মালিককে প্রদান করা হত, ফলে নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় মালিক কর্তৃক শ্রমিকদের বিভিন্ন হয়রানির শিকার হওয়ার সম্ভাবনা ও ইউনিয়ন গঠন বাধাগ্রস্থ হত। সংশোধিত আইনে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে আবেদনের কপি মালিককে দেওয়ার বিধান রহিত করা হয়েছে।
- **গ্রুপ বিমা:** কমপক্ষে ১০০ জন শ্রমিক কর্মরত এরকম কারখানায় গ্রুপ বিমা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- **স্থায়ী স্বাস্থ্য কেন্দ্র:** যেসব কারখানায় ন্যূনতম ৫০০০ জন শ্রমিক রয়েছে সেসব কারখানায় স্থায়ী স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- **কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ:** ৫০০ জন বা ততোধিক সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত রয়েছে সেসকল তৈরি পোশাক কারখানায় কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- **অনুমোদিত নকশা পরিবর্তন না করা:** অনুমোদিত কারখানা ভবন ও মেশিন স্থাপনের নকশার পরিবর্তন না করার বিধান করা হয়েছে।
- **মালিকের শাস্তি বৃদ্ধি:** প্রসূতি কল্যাণে বাধা দিলে মালিকের অর্থদণ্ড ৫,০০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ২৫,০০০ টাকা করা হয়েছে।

সংশোধত আইনে বেশ কিছু ইতিবাচক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হলেও আইনটিতে শ্রমিক স্বার্থবিরোধী অনেক ধারা ও সীমাবদ্ধতা এখনো লক্ষ্য করা যায়-

- **অবাধ ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার লঙ্ঘন:** বাংলাদেশ কর্তৃক অনু-সমর্থিত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কনভেনশন ৮৭ (Freedom of Association and Protection of the Right to Organize) ও ৯৮ (Right to Organize and

[১০] রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৭৪ ।

[১১] ধারা ১৮৫ক, বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালে ৬৬ নং আইন)।

[১২] ধারা ২৮ (১), বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সালে ৩২ নং আইন)।

Collective Bargaining) অনুযায়ী অবাধ ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার রয়েছে সকল শ্রমিকের। কিন্তু বর্তমান আইনানুসারে সর্বক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন বিধান নেই, যেমন- ইপিজেড এলাকায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের বিধান নেই। এছাড়া, অনেক পোশাক কারখানায় শ্রমিক সংখ্যা অনেক বেশি, ফলে ৩০ শতাংশ শ্রমিককে ইউনিয়নে সদস্য করার বিধান [ধারা ১৭৯(২)] বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাস্তবসম্মত নয়, কেননা বাংলাদেশে এমন অনেক তৈরি পোশাক কারখানা রয়েছে যেখানে ৫ থেকে ২০ হাজার শ্রমিক কাজ করে। এসব কারখানায় ৩০ শতাংশ শ্রমিকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ইউনিয়ন গঠন অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। তথ্য দাতাদের মতে উক্ত বিধানের মাধ্যমে কার্যত ইউনিয়ন গঠনের আবেদন প্রক্রিয়াকে কঠিন করা হয়েছে, অথচ আইনের অপর ধারায় ইউনিয়ন নিবন্ধনে আবেদনের কপি মালিককে দেয়ার বিধান রহিত করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনকে জটিল করা হয়েছে।

- **সংজ্ঞা পরিবর্তনের মাধ্যমে শ্রমিকের ব্যাপ্তি হ্রাস:** শ্রম আইন ২০০৬ এ প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনামূলক কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা শ্রমিকের আওতার বাইরে ছিলেন এবং এ সব ব্যক্তিরা শ্রমিক সংগঠনে যুক্ত হতে পারতেন না। কিন্তু মধ্যম সারির তদারকি কর্মকর্তারা (তৈরি পোশাক খাতে তদারকি কর্মকর্তা বলতে উৎপাদন ব্যবস্থাপক হতে শুরু করে ফ্লোর ইনচার্জ পর্যন্ত কর্মকর্তারা) শ্রমিকের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এ সকল কর্মকর্তা শ্রমিক সংগঠনে কারখানা পর্যায়ে নেতৃত্বে ছিলেন। কিন্তু সংশোধিত শ্রম আইনে প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাদের সাথে 'তদারকি কর্মকর্তা' সংযুক্ত করার কারণে [ধারা ২(৬৫)] এ সকল কর্মকর্তারা এখন আর শ্রমিক হিসেবে গণ্য হবেন না তথা ট্রেড ইউনিয়ননেও যুক্ত হতে পারবেন না। তথ্যদাতা শ্রমিক প্রতিনিধি, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও বিশেষজ্ঞদের মতে সুপারভাইজার, মান রক্ষক বা ফ্লোর ইনচার্জ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের শ্রমিকের সংজ্ঞার বাহিরে রাখার কারণে শ্রমিক স্বার্থ ব্যহত হতে পারে। একজন শ্রমিক বিভিন্ন পর্যায়ে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মধ্যম সারির কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। ফলে শ্রমিকদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাদের দক্ষতা থাকে এবং সাধারণ শ্রমিকরা মধ্য সারির এ সব কর্মকর্তাদের নেতৃত্ব মেনে নেন এবং শ্রমিকরা শ্রমিক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত হতেও সাচ্ছন্দবোধ করে। বিশেষজ্ঞদের মতে সংশোধীত আইনে এসব কর্মকর্তাদের শ্রমিকের আওতার বাহিরে রাখার কারণে শ্রমিকদের সংগঠন করা ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার আদায় ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হবে। এ ছাড়া এসব তদারকি কর্মকর্তাদেরকে মালিক চাকরিচ্যুত করলে শ্রম আইনের আওতায় প্রতিকার পাওয়া হতে বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হবে।

- **কারখানার মুনাফা হতে শ্রমিককে বঞ্চনা:** ২০০৬ সালের শ্রম আইন অনুযায়ী কোম্পানির মুনাফায় ৫ শতাংশ শ্রমিকের অংশগ্রহণ ছিল (৮০ শতাংশ "অংশগ্রহণ তহবিলে" এবং ২০ শতাংশ "কল্যাণ তহবিলে")। কিন্তু ২০১৩ সালের সংশোধনীতে শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প খাতের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার বিধান করা হয়েছে। সরকার বিধি দ্বারা ক্রেতা ও মালিকের সমন্বয়ে সেক্টরভিত্তিক কেন্দ্রীয়ভাবে তহবিল গঠনের বিধান করা হয়েছে (ধারা ২৩২)। আপাত দৃষ্টিতে এ ধরণের সেক্টর ভিত্তিক তহবিল গঠনের বিধান তৈরি পোশাক খাতের জন্য ইতিবাচক বলে প্রতিয়মান হয়। কিন্তু বিধি প্রণয়নে দীর্ঘ সময় ব্যয় হলে বা বিধি প্রণীত না হলে কোম্পানির মুনাফা হতে শ্রমিকরা বঞ্চিত হবার ঝুঁকি তৈরি হবে। উল্লেখ্য যে, ৫ শতাংশ হারে মুনাফা প্রদানের বিধান বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এ উল্লেখ্য থাকলেও তৈরি পোশাক কারখানাগুলো এ বিধান অনুসরণ করেনি। এ জন্য সেক্টর ভিত্তিক তহবিল গঠনের বিষয়ে দ্রুত বিধান প্রণয়ন করা জরুরি অন্যথায় শ্রমিকরা আইনগত এ অধিকার হতে বঞ্চিত হবে।

- **মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টি ও শ্রমিক বঞ্চনার ঝুঁকি:** তৈরি পোশাক কারখানার চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সময় ঠিকাদার কর্তৃক শ্রমিক সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে শ্রমিক ঠিকাদার সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে এবং ঠিকাদার সংস্থা কারখানার সাথে যোগাযোগ করে থাকে। এ ধরনের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় শ্রমিক যেমন কাজের জন্য সহজে কারখানার সন্ধান পায় তেমনি কারখানা মালিকও সময়মত ঠিকাদারের মাধ্যমে শ্রমিক পেয়ে থাকে। কিন্তু এ ধরনের ঠিকাদার সংস্থার কোনো নিবন্ধন না থাকার কারণে অনেক সময় শ্রমিক ও মালিক উভয়ের প্রয়োজানে ঠিকাদার সংস্থাকে জবাবদিহিতা কাঠামোতে আনা সম্ভব হয় না। এ প্রেক্ষিতে ২০১৩ সালে আইনের সংশোধনীতে ঠিকাদার সংস্থা নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয় [ধারা ৩ক(১)]। কিন্তু সংশোধীত আইনের ধারা-৩ক এর উপধারা ৩ এ ঠিকাদার কর্তৃক নিয়োগকৃত শ্রমিককে 'ঠিকাদারের শ্রমিক' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যা কারখানা শ্রমিক ও ঠিকাদারের শ্রমিক এর মধ্যে বৈষম্য বা দ্বন্দ্ব তৈরি হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হবে এবং 'ঠিকাদার শ্রমিক' কারখানার অন্যান্য সাধারণ সুযোগ হতে বঞ্চিত হবে। এছাড়া এ সকল শ্রমিকরা ঠিকাদার শ্রমিক হিসেবে গণ্য হওয়ার কারণে 'ঠিকাদার সংস্থা' মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে মধ্যস্বত্বভোগী একটি ব্যবসায়ী শ্রেণি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে, যা দ্বারা শ্রমিক বঞ্চনা বৃদ্ধির ঝুঁকি সৃষ্টি হতে পারে।

- **শ্রমিকদের চাকরিচ্যুত করার আওতা বৃদ্ধি:** আইনের ধারা ২৩এর (খ) "চুরি", "আত্মসাৎ","অসাধুতা" এবং ২৩এর (ছ) "প্রতিষ্ঠানে উচ্ছৃঙ্খলতা, দাঙ্গা হাঙ্গামা, অগ্নিসংযোগ, ভাংচুর" যুক্ত করার মাধ্যমে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ ছাড়া চাকুরিচ্যুত করার বিধান মালিক পক্ষ কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে হয়রানি বা চাকুরিচ্যুত করার উদ্দেশ্যে অপব্যবহারের ঝুঁকির সৃষ্টি করেছে।

- **অংশগ্রহণকারী কমিটির গুরুত্বারোপ:** শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস, সমঝোতা এবং সহযোগীতা বৃদ্ধি ও শ্রম আইন প্রয়োগ নিশ্চিতকল্পে মালিক কর্তৃক বিধি দ্বারা অংশগ্রহণকারী কমিটি তৈরির বিধান রয়েছে (ধারা ২০৫) । আইনানুযায়ী প্রতিষ্ঠানের ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক এ কমিটিতে শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনীত হবে (ধারা ২০৫ এর ৪) এবং যদি ট্রেড ইউনিয়ন না থাকে সেক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনীত হবে (ধারা ২০৫ এর ৬)। কিন্তু বাস্তবে অধিকাংশ কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন না থাকার কারণে মালিক নিজের পছন্দনীয়শ্রমিককে উক্ত কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। মালিক কর্তৃক গঠিত এ ধরনের অংশগ্রহণকারী কমিটির কার্যক্রম ও শ্রমিক প্রতিনিধি সম্পর্কে সাধারণ শ্রমিকগণ জ্ঞাত থাকে না। ফলে এ কমিটি কার্যত মালিক স্বার্থে কাজ করে এবং মালিক কর্তৃক উক্ত কমিটিকে ট্রেড ইউনিয়নের বিকল্প (বা প্রতিপক্ষ) হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রবনতা লক্ষ করা যায়।

- **ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে ক্ষমতার অপব্যবহারের ঝুঁকি:** ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে আবেদনের প্রেক্ষিতে শ্রম মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম মহাপরিচালক 'সন্তুষ্ট' হলে নিবন্ধন প্রদান করবেন (ধারা ১৭৯)। কিন্তু 'সন্তুষ্ট' শব্দের কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা না থাকায় তা দ্বারা অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে।

- **ক্ষতিপূরণ ছাড়া শ্রমিক বরখাস্ত:** ধর্মঘটে অংশগ্রহণের জন্য মজুরি কর্তন (ধারা ১২৬), অননুমোদিত অনুপস্থিতি (ধারা ১২৫) এবং 'অসদাচরণের' কারণে মালিক কর্তৃক ক্ষতিপূরণ ছাড়া শ্রমিক বরখাস্তের বিধান (ধারা ২৩) আইএলও কনভেনশন ২৯ (Force labor) ও ১০৫ (Abolition of force labor) লঙ্ঘন করে।

- **অন্যান্য:**
  - দুর্ঘটনার জন্য মালিক পক্ষের শাস্তি বৃদ্ধি বা কারখানা পরিদর্শকদের জবাবদিহির বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে।
  - শ্রম আদালতের সদস্য নিয়োগে শ্রমিক প্রতিনিধি ও মালিক প্রতিনিধি মনোনয়নে [ধারা ২১৪ (৬,৭.৯)] সরকারের একক কর্তৃত্ব থাকায় রাজনৈতিক দলীয়করণ এবং বিচার কার্যে পক্ষপাতিত্বের ঝুঁকি রয়েছে।
  - কারখানা স্থাপনের কত দিনের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন করতে হবে তা আইনে সুনির্দিষ্ট করা হয়নি (ভিয়েতনামে ৬ মাসের মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন এবং এক বছরের মধ্যে স্থায়ী ইউনিয়ন গঠনের বিধান রয়েছে)।
  - সরকারের পরিপত্র[১৩] অনুসারে প্রসবকালীন ছুটি ২৪ সপ্তাহ বলা হলেও শ্রম আইনে ১৬ সপ্তাহ রয়েছে।
  - প্রতি পাঁচ বছর অন্তর মজুরি বোর্ড গঠন করে মজুরি পুনঃ নির্ধারণ করার বিধান বর্তমান বাস্তবতা ও জীবনমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
  - কর্মস্থলে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল, আলো, পান করার পানি, স্যানিটেশন সুবিধা ইত্যাদির কথা বলা হলেও "পর্যাপ্ত" শব্দটির সঠিক ব্যাখ্যা নেই।
  - ক্ষতিপূরণ বাবদ মৃত্যুজনিত কারণে এক লাখ, স্থায়ী পঙ্গুত্বে এক লাখ পঁচিশ হাজার এবং শিশু শ্রমিকের জন্য দশ হাজার টাকা প্রদানের বিধান রয়েছে (ধারা ১৫১, পঞ্চম তফসিল) যা অপর্যাপ্ত।

বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধন), ২০১৩ এর সাথে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত[১৪] ভিয়েতনাম শ্রম আইনের তুলনামূলক পর্যালোচনা করে দেখা যায় ভিয়েতনাম শ্রম আইনে সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, মালিক-শ্রমিকের মধ্যে 'যৌথ দরকষাকষির চুক্তি' সম্পাদন, প্রতি তিন মাস অন্তর মালিক-শ্রমিক আলোচনা অনুষ্ঠান, ট্রেড ইউনিয়নে বাজেটে মালিক শ্রমিক অংশগ্রহণ, স্বাস্থ্য, বেকারত্ব ও সামাজিক বিমা বিধান রয়েছে, যা বাংলাদেশ শ্রম আইনে অনুপস্থিত (বিস্তারিত দেখুন পরিশিষ্ট-১)।

২.৩ উপসংহার

বাংলাদেশ শ্রম আইনে শ্রম অধিকার ও সংগঠন করার অধিকারসহ বিভিন্ন ইতিবাচক দিক উল্লেখ থাকলেও উক্ত আইনে অনেক বিষয়ে সুস্পষ্টতা ও যথাযথ নীতিমালা না থাকার কারণে শ্রমিকের অধিকার কোনো কোনো ক্ষেত্রে লঙ্ঘিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে শ্রমিকের কর্মকালীন নিরাপত্তা, বিভিন্ন আর্থিক সুযোগ সুবিধা, চাকরির নিশ্চয়তা, সংগঠন করার অধিকার বিষয়ে যেমন শ্রম আইনে অস্পষ্টতা রয়েছে তেমনি আইএলও কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন কনভেনশনের সাথে অসামঞ্জস্যতা বিদ্যমান। আপাত দৃষ্টিতে শ্রম আইন (সংশোধন), ২০১৩ শ্রমিক অধিকার ও সংগঠন করার অধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে বলে বলা হলেও বিভিন্ন প্রবিধান, ধারা ও শব্দ সংযোজনের মাধ্যমে তা আরও দুরূহ করে তোলা হয়েছে।

---

[১৩] এস.আর.ও নং ০৫, স্মারক নং ০৭.১৭৫.০০৮.০৮.০০.০০১.২০০০-১২(২০০), তারিখ:১৮ই জানুয়ারি ২০১১, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

[১৪] ভিয়েতনাম শ্রম আইন প্রণয়নের সাথে আইএলও সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান জড়িত ছিলো, উক্ত আইনটিকে একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন আইন হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে।

অধ্যায় তিন

তৈরি পোশাক খাত-সংশ্লিষ্ট অংশীজন: সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের মতো তৈরি পোশাক খাতে প্রধান তিনটি পক্ষ হচ্ছে মালিক, শ্রমিক ও ক্রেতা। তৈরি পোশাক খাতে সাধারণ ক্রেতা (চূড়ান্ত ভোক্তা) ছাড়াও মালিক ও শ্রমিক পক্ষ উভয়ের মতো শিল্পে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবশালী আরেকটি পক্ষ রয়েছে যারা সম্মিলিতভাবে "বায়ার" নামে পরিচিত। নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও বিভাগ ভূমিকা পালন করে। কারখানার মালিক এ শিল্পের উদ্যোক্তা এবং ব্যবসা হতে অর্জিত লাভ-ক্ষতি ভোগ করে থাকে। মালিকানার দিক হতে একক মালিকানা, যৌথ মালিকানা ও অংশীদারি ভিত্তিতে পরিচালিত কারখানা রয়েছে। মালিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও বিভিন্ন নীতি-সুবিধা আদায় এবং এ খাতের উন্নয়নে কাজ করে মালিক সংগঠন। দেশের রপ্তানিমুখী ওভেন, নিট ও সোয়েটার প্রস্তুত ও রপ্তানিকারকদের ব্যবসায়িক সংগঠন হচ্ছে- বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। তৈরি পোশাক খাতে মালিকদের এ সংগঠনটি মালিকদের ব্যবসায়িক স্বার্থ ও এ খাতের উন্নয়নে কাজ করে থাকে। শ্রমঘন তৈরি পোশাক খাতের প্রধান প্রাণ হচ্ছে শ্রমিক। শ্রমিকের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য শ্রমিক সংগঠন (ট্রেড ইউনিয়ন) কাজ করে। বাংলাদেশে এ শিল্পের বিশেষত্ব হচ্ছে, এ খাতে ক্রেতাপক্ষ সম্পূর্ণভাবে দেশের বাইরে অবস্থান করে এবং দেশীয় ক্রেতা এখানে অনুপস্থিত। এ খাতে বিদেশি ক্রেতাদেরকে 'বায়ার' নামে অভিহিত করা হয়। বায়ার সাধারণত বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠান যারা চূড়ান্ত ভোক্তার কাছে পণ্য বিক্রয় করে থাকে। এই খাতের তদারকি, নিয়ন্ত্রণ ও সেবা প্রদান সরকারের ১৭টি বিভাগ ও সংস্থা হতে হয়ে থাকে, যা ১১টি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন। অর্থাৎ এ খাতে সরকারি ১৭টি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা এবং মালিক, শ্রমিক ও বায়ারসহ মোট ২০টি অংশীজন জড়িত।

সারণি ১: তৈরি পোশাক খাত সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান

নং	দায়িত্ব	বিভাগ বা সংস্থার নাম	মন্ত্রণালয়
১	কারখানার সনদ প্রদান	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর	শ্রম ও কর্মসংস্থান
২	শ্রম সনদ ও ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন	শ্রম পরিদপ্তর	
৩	কারখানার ভবন নির্মাণের নকশা অনুমোদন	রাজউক	গৃহায়ণ ও গণ পূর্ত
৪	ট্রেড সনদ/ কারখানার ভবন নির্মাণের নকশা অনুমোদন	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/ ইউনিয়ন	স্থানীয় সরকার
৫	অগ্নি নির্বাপক ও নিরাপত্তা বিষয়ক সনদ	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৬	বয়লার সনদ	বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	শিল্প মন্ত্রণালয়
৭	পরিবেশ বিষয় সনদ	পরিবেশ অধিদপ্তর	বন ও পরিবেশ
৮	আমদানি নিবন্ধন সনদ ও রপ্তানি নিবন্ধন সনদ	প্রধান আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	বাণিজ্য
৯	তালিকাভুক্তি সনদ ও জিএসপি, সিও, সাপটা ছাড়পত্র	রপ্তানি উন্নয়ন বুরো	
১০	ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেট	বিনিয়োগ বোর্ড	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১১	এন.বি.আর সার্টিফিকেট; ভ্যাট নিবন্ধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	অর্থ
১২	বন্ড সনদ	কাস্টমস এন্ড এক্সাইজ	
১৩	নিবন্ধন	জয়েন্ট স্টক কোম্পানি	
১৪	বিদ্যুৎ সংযোগ	ডেসা/ ডেসকো	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ
১৫	গ্যাস সংযোগ	তিতাস গ্যাস	
১৬	টেলিফোন সংযোগ	বি টি সি এল	ডাক ও টেলিযোগাযোগ
১৭	পানির সংযোগ	ওয়াসা	স্থানীয় সরকার বিভাগ

দেশিয় অর্থনীতিতে তৈরি পোশাক খাতের বিশাল অবদান ও বিশ্বে দ্বিতীয় রপ্তানিকারক দেশ হওয়া সত্ত্বেও এ খাতে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম, কমপ্লায়েন্স ঘাটতি, শ্রমিক অসন্তোষ, অগ্নিকাণ্ড ও দুর্ঘটনা নিয়মিত পরিলক্ষিত হয়। এ জন্য খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনদের দায়িত্বহীনতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি দায়ী বলে ধারণা করার অবকাশ রয়েছে। ২০০৫-০৬ সালে তৈরি পোশাক কারখানায় বিভিন্ন দুর্ঘটনা, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার প্রেক্ষিতে অষ্টম জাতীয় সংসদ মেয়াদে গঠিত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, 'সরকারের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়হীনতা, দায়িত্বহীনতা ও দুর্নীতির অভিযোগ এবং পারস্পরিক যোগ-সাজশে অবৈধ সুবিধা গ্রহণ পোশাক কারখানাগুলোতে সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত না হওয়ার অন্যতম কারণ'।[১৫] বর্তমান নবম জাতীয় সংসদ মেয়াদে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির তদন্ত প্রতিবেদনেও তৈরি পোশাক খাত সংশ্লিষ্ট সরকারি তদারকি সংস্থাগুলোর পর্যাপ্ত জনবল ও সক্ষমতা ঘাটতি রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।[১৬]

এ অধ্যায়ে তৈরি পোশাক খাত-সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অংশীজনের কার্যক্রম, সীমাবদ্ধতা ও অনিয়মের ওপর আলোচনা করা হল।

৩.১ কারখানা মালিক

তৈরি পোশাক খাতে নিরাপদ কাজের পরিবেশ ও সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা এবং শ্রমিকের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ করা মালিক ও মালিক সংগঠনের প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের বিকাশ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ খাতে শুরুর দিকে উদ্যোক্তারা প্রধানত ছিলেন প্রথম পর্যায়ের ব্যবসায়ী (First generation entrepreneur) এবং ৮০ ও ৯০ দশকের অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ও বেসামরিক আমলা (ফৌজিয়া, ২০০৬; কুদ্দুস, ২০০১; মোরশেদ, ২০০৭)। ঐ সময়ে বিকাশমান এ শিল্পে অল্প বিনিয়োগে অতি মুনাফার প্রবণতা এবং সরকারের যথাযথ তদারকির অনুপস্থিতি ও অদূরদর্শিতার কারণে বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় এ শিল্প দ্রুত গড়ে উঠে। সরকার কর্তৃক বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনার কারণে এ শিল্প খুব অল্প সময়ে দেশে বিস্তৃতি লাভ করে এবং রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। সরকার কর্তৃক দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হলেও এ শিল্পের অবকাঠামো, পরিবেশ, স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও নিরাপত্তা এবং শ্রমিক অধিকারের বিষয়গুলো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ১৯৯০-পরবর্তী বিভিন্ন দুর্ঘটনা, অগ্নিকাণ্ড, ভবন ধস, শ্রমিক অসন্তোষের কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মালিক কর্তৃক কারখানা পরিচালনায় বিভিন্ন পর্যায়ে নিম্নলিখিত অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি সংঘটিত হয়ে থাকে।

৩.১.১ টেকনিক্যাল কমপ্লায়েন্স[১৭] বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনিয়ম

- **কারখানা স্থাপনের অনুমোদন নেই এরকম ভবনে কারখানা স্থাপন:** শ্রম আইন ২০০৬ এবং ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ২০০৮ এ কারখানার অবকাঠামোর জন্য সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ কারখানা আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবনে স্থাপিত। আইনত এসব ভবনে কারখানা স্থাপনের বিধান নেই। কিন্তু মালিক কর্তৃক অনেক ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবনে কারখানা স্থাপনের অনুমোদন সংগ্রহ করা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় সাভারের রানা প্লাজা একটি বাণিজ্যিক ভবন (বিপনি বিতান) হওয়া সত্ত্বেও ভবনটিতে তিনটি তৈরি পোশাক কারখানা স্থাপিত হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে কোন প্রকার অনুমোন ছাড়া কারখানা ভবন নির্মান করা হয়। রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর মন্ত্রীসভা পর্যায়ে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয় বেশিরভাগ তৈরি পোশাক কারখানার মৃত্তিকা পরীক্ষা প্রতিবেদন নেই এবং নকশা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নয়[১৮]। এ ধরনের বাণিজ্যিক ভবনে বিকল্প সিঁড়ি থাকে না, ফলে অগ্নিকাণ্ড বা দুর্ঘটনার সময় বিকল্প সিঁড়ি না থাকায় শ্রমিকরা মূল সিঁড়ি ব্যবহার করতে বাধ্য হয় এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও বেশি হয়। রানা প্লাজায় ভবনের বাইরের সাথে সংযোগকারী নিরাপদ বহির্গমনে (Exit discharge) কোন বিকল্প সিঁড়ি না থাকায় ভবনের মূল সিঁড়িতে অধিকাংশ শ্রমিকের মৃতদেহ পাওয়া যায়।

- **মূল সিঁড়ি ও বিকল্প সিঁড়ি স্থাপনে অনিয়ম:** বিকল্প সিঁড়ি ও মূল সিঁড়ি একই বা কাছাকাছি জায়গায় হওয়ায় বিকল্প সিঁড়ির কার্যকারিতা লোপ পায়। যেমন, তাজরিন ফ্যাশনে একাধিক বিকল্প সিঁড়ি ছিল, কিন্তু এসব সিঁড়ির বহির্গমন পথ আইন অনুযায়ী ভবনের বাইরের দিকে না থেকে ভবনের ভেতরে বেইজমেন্টে সংযুক্ত ছিল। ফলে অগ্নিকাণ্ডের সময়ে সব শ্রমিক বের হওয়ার জন্য বেইজমেন্টে চলে আসে, কিন্তু বের হতে না পেরে মৃত্যুবরণ করে। অপরদিকে অনেক কারখানায় বিকল্প সিঁড়িগুলো দুর্বল কাঠামো ও নির্ধারিত মানের না হওয়ায় ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। কোন কোন কারখানায় স্টিল দিয়ে ভবনের বাহির দিকে নির্মিত বিকল্প সিঁড়িগুলোর এক ধাপ থেকে অপর ধাপের উচ্চতা ১০-১২ ইঞ্চি পর্যন্ত (মানসম্মত উচ্চতা হচ্ছে ৬.৮৮ ইঞ্চি[১৯]) হওয়ায় স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যবহার করা যায় না, যা অগ্নিকাণ্ড বা দুর্ঘটনার সময়ে নিরাপদ ব্যবহারের মাধ্যম না হয়ে

---

[১৫] *শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন*, অষ্টম জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, সেপ্টেম্বর ২০০৬, পৃষ্ঠা ৭৭।

[১৬] *শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ২য় প্রতিবেদন*, নবম জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, নভেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা ৫৬।

[১৭] ভবনের কাঠামোগত নিরাপত্তা, বৈদ্যুতিক সংযোগে নিরাপত্তা, অগ্নি নিরাপত্তা ও যন্ত্রপাতির ফ্লোর সেটআপ সংক্রান্ত মানদন্ড।

[১৮] রানা প্লাজা দূর্ঘটনা পরবর্তী মন্ত্রিসভা কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন, সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩।

[১৯] ঢাকা মহানগর ইমারত নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ বিধিমালা, ২০০৮ এর ধারা ৫৮ঘ(২)।

ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরনের সিঁড়ি স্থাপনের মাধ্যমে মালিকপক্ষ দৃশ্যত আইনের বিধান পালন করে, কিন্তু এ ধরনের সিঁড়ির মূল উদ্দেশ্য দুর্ঘটনাকালীন সময়ে নিরাপদ বের হয়ে আসার নিশ্চয়তা প্রদান করে না।

- **অগ্নি নিরাপত্তা কোড না মানা:** অনেক ক্ষেত্রে কারখানাগুলোতে মালিক কর্তৃক অগ্নি-নিরাপত্তাজনিত বিষয়, যেমন ২৫ ভাগ ছাদ খোলা রাখা, টিনের ছাদ না দেওয়া, অগ্নি নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি, জলাধার এবং সঠিক নিয়মে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা ইত্যাদি নিশ্চিত করা হয় না।

- **বিদ্যুৎ সংযোগে অনিয়ম:** অনুমোদিত বৈদ্যুতিক নকশার মানদণ্ড না মেনে কারখানার ধারণ ক্ষমতার চেয়ে কম বা বেশি পরিমাণে বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণ করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্ধারিত মানের চেয়ে নিম্নমানের বৈদ্যুতিক তার, সুইচ ব্যবহার ও নির্দিষ্ট সময়ান্তে পরিবর্তন বা সংস্কার করা হয় না। এছাড়া, অনুমোদিত মেশিনের সংখ্যার চেয়ে বেশি মেশিন স্থাপন ও বৈদ্যুতিক লোড ক্যাপাসিটির চেয়ে অধিক ভোল্টেজের যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যা অগ্নি দুর্ঘটনার ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

৩.১.২ সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়ন না করা

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত সম্পূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক বাজারের ওপর নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় প্রক্রিয়ায় কিছু আন্তর্জাতিক স্বীকৃত মানদণ্ড নিশ্চিত করতে হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে শুধুমাত্র বাজার চাহিদা এবং বাণিজ্য চুক্তির ওপর গ্লোবাল ভ্যালু চেইন[২০] (Global Value Chain) নির্ভরশীল থাকে না, বরং বিভিন্ন সামাজিক ও মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয় এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক ক্রেতাকে উন্নত দেশের বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন, এনজিও ও ট্রেড ইউনিয়নের অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয় এই বলে যে, তারা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে 'সোয়েট শপ'[২১] পরিচালনা করছে এবং শিশু শ্রম উৎসাহিত করছে। এমন অভিযোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক ক্রেতারা উৎপাদিত পণ্যের মান, নিরাপত্তা, শ্রমিক অধিকার, কর্ম-পরিবেশ ও শিশু শ্রম বিষয়ে বেশকিছু মানদণ্ড তৈরি করে এবং তাদের আঞ্চলিক সরবরাহকারীদের তা মেনে চলার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। এসব মানদণ্ড কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত আচরণ বিধি (Code of Conduct) হিসেবে পরিচিত (হামফ্রে ও স্মিজ, ২০০৪)। কিন্তু বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে অনেক ক্ষেত্রে এসব মানদণ্ড সঠিকভাবে মানা হয় না এবং অভিযোগ রয়েছে যে এ খাতের কর্ম-পরিবেশ নিয়মিত আন্তর্জাতিক মানদণ্ড এবং আচরণ বিধি ভঙ্গ করছে (হক, ২০০১)। এ কমপ্লায়েন্স ঘাটতির কারণে কারখানা পর্যায়ে অগ্নিকাণ্ড, দুর্ঘটনা ও শ্রমিক অসন্তোষসহ নানাবিধ সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। নিচে কারখানা পর্যায়ে সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়নে কিছু অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরা হল-

- **নিয়োগ, মজুরি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অনিয়ম:** বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতের উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক বায়ারদের আকর্ষণের অন্যতম কারণ নিম্ন মজুরি, বর্তমানে যা ৩৭.৫ মার্কিন ডলার (তিন হাজার টাকা)। অন্যান্য প্রতিযোগী দেশের তুলনায় এ হার সর্বনিম্ন। প্রতিযোগী রপ্তানিকারক রাষ্ট্র যা ভারত[২২], কম্বোডিয়া[২৩], ভিয়েতনাম[২৪] ও চীনে[২৫] যথাক্রমে ১১৮, ৮০, ১১৩ ও ২২৮ ডলার।

  গবেষণায় দেখা যায় অধিকাংশ কারখানায় ন্যূনতম মজুরি প্রদান করা হলেও শ্রমিকদের অতিরিক্ত কর্ম-ঘণ্টা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার প্রাপ্য অর্থ সঠিকভাবে প্রদান করা হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিয়োগপত্র শ্রমিকের হাতে না দেওয়া এবং মজুরি রশিদ না দেওয়ার কারণে শ্রমিক প্রকৃত মজুরি হতে বঞ্চিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বায়ারদের দেখানোর জন্য শ্রমিকদের ভিন্ন ভিন্ন নিয়োগপত্রে স্বাক্ষর নেওয়া হয়, যেখানে বেতনের তারতম্য থাকে। যেমন, একজন শ্রমিককে নিয়োগপত্রে বেতন ৪,৮০০ টাকা দেখানো হলেও তাকে বাস্তবে দেওয়া হয় ৩,৯০০ টাকা (কেয়ার, ২০১২)। আবার ২০১০ এর সর্বনিম্ন মজুরি বোর্ডের নিয়ামানুযায়ী বেশিরভাগ কারখানায় সর্বনিম্ন স্কেলের নিয়ম মানলেও গ্রেড বৃদ্ধিতে অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়। এ ক্ষেত্রে একজন শ্রমিক গ্রেড ৭ (সর্বনিম্ন) থেকে দুই বছরের মধ্যে গ্রেড ৬-এ উন্নীত হলেও অন্যান্য পর্যায়ে পদোন্নতি লাভ

[২০] কাঁচামাল সংগ্রহ হতে শুরু করে পণ্য উৎপাদন, বিপণন, বাজারজাতকরণসহ আন্তর্জাতিক বাজারে কোন চূড়ান্ত ভোক্তার নিকট পণ্য পৌঁছে দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে (গবেষণা, উন্নয়ন, নকশা, অংশ উৎপাদন, বিভিন্ন অংশ জোড়া দেওয়া, বাজারজাতকরণ এবং মার্কা দেওয়া ইত্যাদি) পণ্যটিতে মূল্য সংযোজন ও শৃঙ্খলতায় আবদ্ধ প্রক্রিয়াটিকে 'গ্লোবাল ভ্যালু চেইন' নামে পরিচিত।

[২১] কোন কর্মপরিবেশের নেতিবাচক অর্থপ্রকাশ করে, যেখানে কাজ করা কঠিন অথবা ভয়ঙ্কর।

[২২] Minimum Wages Update in NCR, India, year, 2012-2013, www.onlineclothingstudy.com, Accessed on 9 November, 2013.

[২৩] www.khumarization.blog.spot.com, accessed on 8/10/13.

[২৪] www.thephnompenhpost.com, accessed on 8/10/13.

[২৫] www.clb.org.hk, accessed on 8/10/13.

করতে আরও দীর্ঘ সময় লাগে এবং গ্রেড অনুযায়ী মজুরি কাঠামো মেনে চলা হয় না। ফলে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করার পরও একজন শ্রমিককে নিম্ন বেতন কাঠামোতে কাজ করতে হয়, যা দিয়ে শ্রমিকের দৈনন্দিন জীবন-ধারণ সম্ভব হয় না, বরং তাদেরকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায় ফেলে, হ্রাস পায় শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা (আইএলও, ২০০৫; মোরশেদ, ২০০৭)। অন্যদিকে উৎপাদন সংখ্যা অনুযায়ী যেসব কারখানায় (সোয়েটার কারখানা) মজুরি নির্ধারণ করা হয় সেখানে সাধারণত উৎপাদনের সংখ্যা-প্রতি মজুরি প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো লিখিত চুক্তি হয় না এবং মৌখিকভাবে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কম প্রদান করা হয়। এছাড়া যেসব কারখানায় ঠিকাদারের মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয় সেখানে মধ্যস্বত্বভোগী তৈরি হওয়ার কারণে শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হয়।

- **হাজিরা বোনাস প্রদানে অনিয়মঃ** মালিক কর্তৃক শ্রমিকদের কাজে উৎসাহিত করার জন্য হাজিরা বোনাস এর ব্যবস্থা রাখা হয় যা মজুরির সাথে অতিরিক্ত প্রদেয়, কারখানা ভেদে এর পরিমাণ ৩০০ থেকে ৬০০ টাকা। এ ক্ষেত্রে কারখানায় তিনদিন পর্যন্ত দেরিতে আসলেও তা পাওয়ার প্রচলিত বিধান রয়েছে। তবে বাস্তবে অনেক কারখানায় একদিন দেরি হলে তা কেটে নেওয়া হয়, যা শ্রমিককে সবসময় মানসিক চাপে রাখার ঝুঁকি সৃষ্টি করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকদের নিবিড় সাক্ষাৎকারে জানা যায় দুর্ঘটনার দিন তাদের (শ্রমিকদের) কাজে যোগদানের পেছনে অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি ছিল হাজিরা বোনাস হতে বঞ্চনার ভয় ও বোনাসের প্রলোভন।

- **বেতন ও বোনাস না দিয়ে কারখানা বন্ধ করে চলে যাওয়াঃ** অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকের বেতন, বিশেষ করে ঈদ বোনাস না দিয়ে কারখানা বন্ধ করে চলে যাওয়ার নজির রয়েছে। এ ক্ষেত্রে মালিক কারখানাটি বন্ধ করলেও অপর জায়গায় মেশিন স্থানান্তর করে ব্যবসা পরিচালনা করে কিংবা মালিকানা পরিবর্তন করে ব্যবসা পরিচালনা করে। উভয় ক্ষেত্রে শ্রমিক তার প্রাপ্য মজুরি ও বোনাস থেকে বঞ্চিত হয়। যেমন- তাজরিন ফ্যাশনের মালিকের মালিকানাধীন তুবা গ্রুপের রাজধানীর মধ্যবাড্ডার হোসেন মার্কেট এবং ফুজি টাওয়ারে অবস্থিত দুটি কারখানা ঈদের পূর্বে বন্ধ করে দেয়ার পাঁয়তারার অভিযোগ পাওয়া যায়[২৬], পরবর্তীতে বিজিএমইএ'র হস্তক্ষেপে বিষয়টির সমাধান হয়।

- **কর্ম-ঘণ্টার ক্ষেত্রে অনিয়মঃ** বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এবং আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী দৈনিক আট ঘণ্টা এবং অতিরিক্ত দুই ঘণ্টাসহ মোট ১০ কর্ম-ঘণ্টার বেশি কাজ না করানোর বিধান রয়েছে। বাস্তবে বেশিরভাগ তৈরি পোশাক কারখানায় অতিরিক্ত কর্ম-ঘণ্টা আরও বেশি হয় (হক.এ, ২০০১)। রানা প্লাজার দুর্ঘটনা-পরবর্তী বিবিসি'র এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে দেখানো হয় ঢাকার একটি পোশাক কারখানায় দৈনিক ১৯ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করানো হয়।[২৭] অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকদের জোর করে এবং ভয়ভীতি প্রদর্শন করে অতিরিক্ত কাজ করানো হয়, আবার মূল মজুরি কম হওয়ার কারণে শ্রমিকরাও অতিরিক্ত আয়ের আশায় অধিক কর্ম-ঘণ্টা কাজ করতে বাধ্য হয়। এ ক্ষেত্রে মূলত বায়ার নিরীক্ষণে অতিরিক্ত কর্ম-ঘণ্টার হিসাব লুকানো হয় এবং অতিরিক্ত কর্ম-ঘণ্টার মজুরি মাসিক বেতনের সাথে না দিয়ে দেরিতে প্রদান করা হয়। অপরদিকে, ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত কর্ম-ঘণ্টার হিসাব তাতে সংরক্ষণ না করে হাতে লেখা হয়, ফলে শ্রমিক তার প্রকৃত কর্ম-ঘণ্টার হিসাব ও ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। শ্রম আইন অনুসারে অতিরিক্ত কর্ম-ঘণ্টার মজুরি দ্বিগুণ হারে প্রদানের নিয়ম থাকলেও অনেক কারখানায় তা মানা হয় না এবং কিশোর শ্রমিকদের (১৪-১৮ বছর) ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি এবং কর্ম-ঘণ্টা (৫ ঘণ্টা) মেনে চলা হয় না।

- **মাতৃত্বকালীন সুযোগ-সুবিধা প্রদানে অনিয়মঃ** সরকার কর্তৃক সরকারি-বেসরকারি সকল পর্যায়ে মাতৃত্বকালীন ছুটি ২৪ সপ্তাহ ঘোষণা করা হলেও তৈরি পোশাক কারখানায় বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩ অনুসারে ১৬ সপ্তাহ ছুটির বিধান রয়েছে। কিন্তু সকল তৈরি পোশাক কারখানা সন্তান-সম্ভবা নারী শ্রমিকদেরকে প্রাপ্য এ ছুটি দেয়া হয় না। কেয়ার-এর (২০১২) গবেষণায় দেখা যায়, তৈরি পোশাক খাতে ২৮% নারী আইনানুযায়ী পারিশ্রমিকসহ মাতৃত্বকালীন ছুটি পান না। আবার কোন কোন কারখানায় ছুটি দেওয়া হলেও আইনানুগ সুবিধা প্রদান করা হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারী কর্মী তার গর্ভাবস্থার কথা চেপে যায়, কেননা মালিকদের ভেতরে এসব কর্মীকে চাকরিচ্যুত করার প্রবণতা রয়েছে (মজুমদার ও বেগম, ২০০০)। বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য হতে জানা যায়, রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় ধ্বংস স্তূপে দু'জন নারী সন্তান প্রসব করেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ দু'জন নারী তাদের গর্ভাবস্থার কথা চেপে কাজ করছিলেন। উল্লেখ্য, তৈরি পোশাক কারখানায় 'জেন্ডার কোড অব কনডাক্ট' এর অনুপস্থিতি রয়েছে।

- **শিশু শ্রমঃ** আইন অনুযায়ী তৈরি পোশাক কারখানায় শিশু শ্রম (১৪বছরের নিচে) নিষিদ্ধ। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ ও কারখানা মালিকদের সহায়তায় দেশের বেশির ভাগ তৈরি পোশাক কারখানা শিশু শ্রম মুক্ত হলেও এখনও কিছু কারখানায়

[২৬] বিস্তারিত দেখুন http://dhakatimes24.com, ১২ অক্টোবর ২০১৩।

[২৭] BBC News, 23 September, 2013 and www.bbc.co.uk accessed on 30th September, 2013.

শিশুদের নিয়োগ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে কারখানার নিজস্ব চিকিৎসক দ্বারা ছাড়পত্রের মাধ্যমে ১০ থেকে ১৪ বছরের নিচের শিশুদের ১৪-১৮ বছর বয়স সীমার মধ্যে দেখানো হয়, যারা কিশোর শ্রমিক হিসেবে পরিচিত। এসব কর্মীদের ক্ষেত্রে সাধারণত ন্যূনতম মজুরি ও কর্ম-ঘণ্টা মেনে চলা হয় না। কম মজুরিতে এ ধরনের শিশুদের কাজ করানো যায় বলে মালিকপক্ষ এ ধরনের শিশুদের নিয়োগে আগ্রহী থাকে। এক গবেষণায় দেখা যায়, অনিরাপদ ও অস্বাস্থ্যকর কর্ম-পরিবেশে কাজ করার কারণে শিশুরা বিভিন্ন ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হয় এবং কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন দুর্ঘটনার শিকার হয়, যা তাদের স্বাভাবিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে (রহমান ও নূর, ১৯৯৯)।

- **স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে অনিয়মঃ** অনেক কারখানায় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যে কর্ম-পরিবেশ এবং কাঠামো থাকা দরকার তার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কারখানাগুলোতে সাধারণত অপর্যাপ্ত পরিসর, তুলা জাতীয় ধুলা ব্যবস্থাপনার অভাব ও নিয়ন আলোর তাপ শ্রমিকদের শারীরিক অসুস্থতার কারণ ঘটায়। এছাড়াও বিশ্রামাগার, বিশুদ্ধ খাবার পানি, পর্যাপ্ত টয়লেট, ক্যান্টিন এবং অনেক ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ফ্যানের অভাব পরিলক্ষিত হয় (খান, ২০০৬)। অনেক ক্ষেত্রে বিকল্প সিঁড়ি ও মূল সিঁড়ি একই বা কাছাকাছি জায়গায় হওয়ায় বিকল্প সিঁড়ির কার্যকারিতা লোপ পায়। উদাহরণ হিসেবে তাজরিন ফ্যাশনের দুর্ঘটনা উল্লেখ করা যায়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিকল্প সিঁড়ি দুর্বল কাঠামোর হওয়ায় ঝুঁকির সৃষ্টি করে। কারখানাগুলোতে অগ্নি ও নিরাপত্তা মহড়া নিয়মিত হওয়ার নিয়ম থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি অনিয়মিত ও অপর্যাপ্ত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো প্রশিক্ষণই দেওয়া হয় না।

- **গ্রুপ বিমা না করাঃ** আইন অনুযায়ী ন্যূনতম ১০০ জন শ্রমিক কোনো কারখানায় থাকলেই শ্রমিকের গ্রুপ বিমা করা বাধ্যতামূলক, কিন্তু অনেক কারখানায় এ নিয়ম মানা হয় না। বিজিএমইএ কর্তৃক গ্রুপ বিমা প্রতিটি কারখানায় করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলেও অনেক কারখানা তা অমান্য করে। অবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যেসব কারখানায় গ্রুপ বিমা করা হয়েছে সেখানে প্রকৃত শ্রমিকের সংখ্যার চেয়ে কম শ্রমিক দেখানো হয়। কেননা শ্রমিকের সংখ্যার অনুপাতে বিমার টাকার পরিমাণ নির্ধারিত হয়। উল্লেখ্য যে রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী বিজিএমইএ কর্তৃক সদস্য কারখানায় গ্রুপ বিমা নিশ্চিত করার নির্দিষ্ট সময় সীমা বেঁধে দেওয়া হয় এবং যে সব কারখানা গ্রুপ বিমা করেনি তাদেরকে বিজিএমই কর্তৃক বিভিন্ন সুবিধা (যেমন ইউটিলাইজেইশন ডিকলারেশন, ইউডি) প্রদান বন্ধ করে দেওয়া হয়।

৩.১.৩ শ্রমিক অধিকার সংরক্ষণ না করা

- **কারখানা পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে হয়রানিঃ** পোশাক শিল্পের ব্যবসায়িক সংস্কৃতিতে ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে এক ধরনের নেতিবাচক মনোভাব রয়েছে। মালিক পক্ষ ট্রেড ইউনিয়নকে উৎপাদন সহায়ক না ভেবে শিল্পের জন্য হুমকি হিসেবে গণ্য করে। ট্রেড ইউনিয়নের রাজনৈতিক চরিত্র, দুর্নীতির অনুশীলন এবং ধ্বংসাত্বক আচরণ-এ বিষয়গুলো মালিকদেরকে ট্রেড ইউনিয়ন বিষয় নেতিবাচক মনোভাব গঠনে ভূমিকা রাখে (কবির, ২০০৪)। মালিকপক্ষের এ ধরনের মানসিকতার কারণে শ্রমিকরা যাতে সংগঠিত হতে না পারে সে জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে মালিকপক্ষ নিয়োগপত্র ও চাকরি হতে অব্যাহতিপত্রে একই সাথে স্বাক্ষর করে নিয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে অব্যাহতিপত্রে কোনো তারিখ লেখা থাকে না, পরবর্তীতে উক্ত শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নে যুক্ত হলে বা শ্রমিক অধিকারের দাবি তুললে মালিক তার সুবিধা মত তারিখ বসিয়ে শ্রমিককে চাকরিচ্যুত করে থাকে।

- **স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষমতার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে শ্রমিক নিয়ন্ত্রণঃ** শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রমিক অধিকারের দাবিতে উচ্চকিত শ্রমিকদের অবদমিত করে রাখার জন্য মালিকপক্ষ স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা ও মাস্তানদের দ্বারা মারধোর, ভয়ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন করে থাকে। এ ক্ষেত্রে মালিক স্থানীয় নেতা ও মাস্তানদেরকে ঝুট ব্যবসা, পরিবহণ ও খাদ্য সরবরাহের ঠিকাদারি প্রদান এবং বিভিন্ন উৎসবে চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে সন্তুষ্ট রাখে। গাজীপুরে অবস্থিত একটি পোশাক কারখানার মালিকের ভাষ্য অনুযায়ী, "জাতীয় ও বিভিন্ন দিবস উদযাপনের জন্য যেমন চাঁদা দিতে হয়, তেমনি নির্বাচনের সময় স্থানীয় প্রার্থীদেরও টাকা দিতে হয়। কারখানায় কোনো সমস্যা হলে ওরা দেখে"।

- **অর্থের বিনিময়ে পুলিশ/ শিল্প পুলিশকে শ্রমিক আন্দোলন দমনে ব্যবহারঃ** বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিল্প পুলিশ নামে একটি বিশেষ পুলিশ বাহিনী গঠন করা হয়। বিশেষজ্ঞ তথ্যদাতাদের মতে অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশে শিল্প পুলিশ বা পুলিশ বাহিনী শ্রমিক আন্দোলনকে শ্রমিকের অধিকারের আন্দোলনের পরিবর্তে আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ মনে করে। অভিযোগ রয়েছে যে মালিকপক্ষ অর্থনৈতিক ও স্থানীয় রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে পুলিশকে কারখানা পর্যায়ে সংগঠিত বিভিন্ন আন্দোলন দমনে ব্যবহার করে।

- **অংশগ্রহণকারী কমিটির ওপর গুরুত্ব আরোপঃ** শ্রম আইন অনুযায়ী কারখানা পর্যায়ে মালিক শ্রমিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। তথ্যদাতাদের মতে মালিকপক্ষ এ সুযোগ নিয়ে ট্রেড ইউনিয়নের পরিবর্তে

অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠনে অধিক আগ্রহী থাকে। তবে, এই কমিটি গঠনের ক্ষেত্রেও অনিয়ম রয়েছে বলে জানা যায়। যেমন-মালিক কর্তৃক 'বিধি' প্রণয়ন না করে মালিকের ইচ্ছানুসারে এ কমিটি গঠন করা হয়। আইনানুযায়ী ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক অংশগ্রহণকারী কমিটিতে শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনীত করার নিয়ম রয়েছে (ধারা ২০৫)। অর্থাৎ প্রথমে ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হবে এবং পরবর্তীতে ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক মনোনীত শ্রমিক প্রতিনিধির মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠিত হবে। কিন্তু, বাস্তবে কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের পূর্বেই মালিক কর্তৃক অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠন করা হয় এবং এ কমিটিকে ট্রেড ইউনিয়নের বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন না থাকার দরুন মালিক নিজেই তার পছন্দনীয় শ্রমিকদের এ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। ফলে এ ধরনের কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাধারণ শ্রমিকরা ওয়াকিবহাল থাকে না।

৩.১.৪ পরিদর্শন কাজে আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার

সরকারি সংস্থা কর্তৃক কারখানা পরিদর্শনের সময় কারখানা মালিকরা সামাজিক নেটওয়ার্ক ব্যবহারের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করে। পরিদর্শক কোনো কারখানা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নিলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মালিকপক্ষ তাদের রাজনৈতিক সম্পর্কের মাধ্যমে সরকারি তদারকি সংস্থার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। ঢাকার একজন শ্রমিক নেতা জানান, "একজন সাবেক মন্ত্রীর আত্মীয়ের কারখানায় শ্রমিক হয়রানি সংক্রান্ত অভিযোগ আনায় একজন সাবেক প্রধান পরিদর্শকের চাকরি চলে যাওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল"।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুযায়ী ক্লাস ১ (দালান) এবং ক্লাস ২ (অন্যান্য সামগ্রী) এক করে কারখানা নির্মাণ করা যাবে না এবং কারখানার ছাদে টিনের ব্যবহার নিষিদ্ধ। একজন ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্স কর্মকর্তা জানান, গরিব অ্যান্ড গরিব গার্মেন্টসে অগ্নিকাণ্ড ঘটার পর দেখা যায় এ কারখানায় উক্ত নিয়ম মানা হয়নি। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স হতে উক্ত কারখানার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিলে মালিকপক্ষ কারখানাটির সনদ বাতিল না করা এবং ৭৫ ভাগ টিন এবং ২৫ ভাগ খোলা রাখার অনুমতি দেওয়ার জন্য প্রভাবশালীদের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় থেকে চিঠি ইস্যু করে।

৩.২ মালিক সংগঠন (বিজিএমইএ)

বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতের ওভেন, নিট ও সোয়েটার প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক মালিকদের ব্যবসায়িক সংগঠন হচ্ছে 'বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি' (বিজিএমইএ)[২৮]। তৈরি পোশাক খাতে মালিকদের এ সংগঠন মালিকদের ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষা ও এ খাতের উন্নয়নে কাজ করে থাকে। দেশের অন্যান্য ব্যবসায়িক খাতভিত্তিক মালিক সংগঠনের (যেমন চামড়াজাত দ্রব্য ও জুতা প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি, বায়রা ইত্যাদি) মতো বিজিএমইএ প্রতিষ্ঠিত ও নিবন্ধিত। কিন্তু সংগঠনটি তার বিভিন্ন কার্যক্রম[২৯], কর্মসংস্থান ও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সর্বাধিক অবদান থাকার সুযোগ নিয়ে সংগঠনটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার মাধ্যমে নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে হস্তক্ষেপ করে থাকে। আবার সাংগঠনিক কাঠামোতে পরিচালনা বোর্ড নির্বাচনে অভ্যন্তরীণ গ্রুপিং, জাতীয় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততা ও নিজ গ্রুপের কারখানার প্রতি শৈথিল্য[৩০] প্রদর্শনসহ সাংগঠনিক কার্যক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক বিধি-বিধানের অনুপস্থিতির[৩১] কারণে বিজিএমইএ তৈরি পোশাক খাতের সামগ্রিক উন্নয়নে আশানুরূপ ভূমিকা পালন করতে পারে না। গঠনতন্ত্র অনুসারে

---

[২৮] ১৯৮০ সালে ৩০টি কারখানার সদস্য পদের মাধ্যমে বিজিএমইএ প্রতিষ্ঠিত হয়, বিস্তারিত-www.bgmea.com.bd/home/pages/aboutus.

[২৯] বিজিএমইএ এর উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে- বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী এ খাতের স্বার্থ সংরক্ষণ ও টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা; বিদেশী ক্রেতা, ব্যবসায়িক গোষ্ঠী, সংস্থা ও বণিক সমিতির সাথে যোগাযোগ স্থাপন; দেশ-বিদেশে বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহনের মাধ্যমে দেশীয় পোশাক প্রস্তুতকারকদের সাথে বিদেশী ক্রেতাদের যোগাযোগ স্থাপন; সদস্য কারখানার মালিক ও শ্রমিকের স্বার্থ ও আইনানুগ অধিকার রক্ষা করা; নতুন বাজার সৃষ্টি ও বিদ্যমান বাজারে ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য ব্যবসায়িক মিশন পরিচালনা ও সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন; শ্রমিকের অধিকার, সামাজিক ও পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স এবং কল্যাণ নিশ্চিতে নিয়মিত কার্যক্রম গ্রহণ; মনিটরিং এর মাধ্যমে সদস্যভূক্ত কারখানা শিশু শ্রম মুক্ত রাখা; বিজিএমইএ কর্তৃক বিভিন্ন খাত ভিত্তিক কর্ম বিভাজনের (Labour Arbitration Cell (1 & 2); One stop Cell; RDTI and MIS Cell; Environment cell; Arbitration Cells; Compliance Cell) মাধ্যমে সদস্যভুক্ত কারখানায় কর্মমান উন্নয়নে পরামর্শ সেবা প্রদান; শ্রমিক ও শ্রমিকদের পরিবার সদস্যদের ১২টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান; বিনা খরচে শ্রমিকদের সালিশী সেবা প্রদান; শ্রমিক ও কর্মচারিদের মধ্যে গ্রুপ বিমা নিশ্চিত করা; শ্রমিকদের বায়ো-মেট্রিক্স ডাটা বেজ সংরক্ষণ ইত্যাদি উল্লেখ্যযোগ্য (বিস্তারিত দেখুন- BGMEA Members Directory 2012-13, pp-5-6 & 17-18)। কিন্তু বিজিএমইএ তাদের ঘোষিত কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন ও অনুসরণ না করার কারণে সদস্য কারখানাগুলোতে কমপ্লায়েন্স ঘাটতিতে নিরাপত্তা ঝুকির সৃষ্টি হয় এবং শ্রমিকরা দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়।

[৩০] তাজরিন ফ্যাশনের মালিককে বিজিএমইএ'র তৎকালীন পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক আশ্রয় প্রদান; রানা প্লাজায় অবস্থিত কারখানাগুলোকে কমপ্লায়েন্স ঘাটতি থাকার পরও "এ" ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্তি; সদস্য না হয়েও রপ্তানি সুবিধা প্রদান ইত্যাদি।

[৩১] বিজিএমইএ কর্তৃক বিভিন্ন সেবা সংক্রান্ত; কর্মকর্তা নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি সংক্রান্ত; আর্থিক জবাবদিহিতা; বিরোধ নিষ্পত্তি; শ্রমিক কল্যাণ; বিভিন্ন সেল ও কমিটির কার্যক্রম ইত্যাদি সংক্রান্ত সুস্পষ্ট বিধিমালার অনুপস্থিতি বা অস্পষ্টতার কারণে সাংগঠনিক কার্য পরিচালনায় ব্যক্তি স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহারের ঝুঁকি রয়েছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে অনিয়ম সংগঠিত হয়।

বিজিএমইএ তৈরি পোশাক খাতের সামগ্রিক উন্নয়নে কাজ না করে এ খাতের 'মালিকদের' এর উন্নয়নে কাজ করে। যেমন বিজিএমই সদস্য ভুক্ত কোনো কোনো নন-কমপ্লায়েন্স কারখানাকে বিজিএমইএ কর্তৃক কমপ্লায়েন্স কারখানা বলে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে কারখানা মালিক উপকৃত হলেও খাত সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের জন্য এবং দীর্ঘ মেয়াদে গোটা খাতের জন্য ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মালিক কর্তৃক এ ধরনের সুবিধা আদায়ে কারখানা মালিকের কারখানার সংখ্যা, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। অনেক সময় সাধারণ সদস্যগণও প্রতিষ্ঠানটি হতে আশানুরুপ সহযোগিতা পান না। বিজিএমইএ'র সদস্য একজন গার্মেন্টস মালিক বিজিএমইএ-কে তৈরি পোশাক শিল্পের "এলিটদের ক্লাব" বলে মন্তব্য করেন। নিচে গবেষণায় প্রাপ্ত বিজিএমইএ'র প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরা হল যা তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

৩.২.১ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও সরকারি কর্তৃত্ব চর্চা

বিজিএমইএ অন্যান্য ব্যবসায়ী সংগঠনের মত মালিকদের একটি সংগঠন, কোনো নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ নয়। কিন্তু বিজিএমইএ অনেক কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতা ভোগ করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তৈরি পোশাক খাতে ইউডি ছাড়পত্র বিজিএমইএ কর্তৃক প্রদান করা হয় যা দেশের অন্যান্য শিল্পখাতে সরকারি সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত হয় (যেমন ওষুধ শিল্পে এ ছাড়পত্রটি ওষুধ অধিদপ্তর থেকে প্রদান করা হয়)। এছাড়া বিজিএমইএ'র অনুমোদন ছাড়া পোশাক রপ্তানি ও অন্যান্য সুবিধাও পাওয়া যায় না। অনেকাংশে ব্যবসায়ী সংগঠনটি ভূমিকা সরকারি এজেন্সির মত দেখা যায়[৩২]। অথচ বিজিএমই এ দেশের আইন অনুযায়ী কোন নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ নয়, এটি পোশাক ব্যবসায়ীদের সংগঠন (ক্লাব)[৩৩]।

৩.২.২ অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার অভাব

বিজিএমইএ সদস্য কারখানাগুলোকে বিভিন্ন ধরনের সেবা (অগ্নি নিরাপত্তা ও কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সুপারিশ ও দিক নির্দেশনা, শ্রমিক কল্যাণ, বিরোধ নিষ্পত্তি, পোশাকের মান পরীক্ষাগার ইত্যাদি) দিয়ে থাকে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ না করার অভিযোগ রয়েছে। বিজিএমইএ কর্তৃক - অগ্নি-নিরাপত্তা ও কমপ্লায়েন্স সনদ প্রদান করা হলেও বাস্তবে দেখা যায় কারখানাগুলো কমপ্লায়েন্ট নয়, যেমন রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী টাস্ক-ফোর্স কর্তৃক বিজিএমইএ কর্তৃক সনদ প্রদত্ত ৩৪টি কমপ্লায়েন্ট কারখানায় পুনঃনিরীক্ষণে কমপ্লায়েন্স পাওয়া যায়নি। তথ্যদাতাদের মতে বিজিএমইএ'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করার কারণে নন-কমপ্লায়েন্ট কারখানা সংস্থাটি হতে বিভিন্ন সুবিধা আদায় করে নিচ্ছে। এছাড়া, আর্থিক নিরীক্ষা প্রতিবেদনের স্বচ্ছতার ঘাটতি রয়েছে। বিজিএমইএ'র অভ্যন্তরে বিভিন্ন সেবা ও দায়িত্ব সংক্রান্ত ১০৬টি স্থায়ী কমিটি বা সেল রয়েছে কিন্তু এসব কমিটির অনেকটির সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও জবাবদিহিতার প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালার ঘাটতি ও অনুপস্থিতি রয়েছে। ফলে বিজিএমইএ কর্তৃক বিভিন্ন সেবা ও দায়িত্ব পালনে অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতির ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। এছাড়া দাতা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম, যেমন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, কর্মসংস্থান প্রকল্প, স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অর্থব্যয়ে স্বচ্ছতার ঘাটতির অভিযোগ পাওয়া যায়। প্রাপ্ত তথ্য মতে বিজিএমইএ কর্তৃক পরিচালিত ১২টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে শ্রমিকদের বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহের কথা থাকলেও ওষুধ দেওয়া হয় না। আবার বিভিন্ন দুর্ঘটনার পর বায়ার কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ বণ্টনে অনিয়ম ও অস্বচ্ছতার অভিযোগ পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে তাজরিন ফ্যাশন ও রানা প্লাজার ক্ষতিপূরণ নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগের উল্লেখ করা যায়।

৩.২.৩ বিরোধ নিষ্পত্তিতে অনিয়ম

এ খাতের বিভিন্ন অংশীজনদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বিজিএমইএ'তে প্রায় ১১টি নিষ্পত্তি সেল রয়েছে।[৩৪] এ সব বিরোধ নিষ্পত্তি সেলে বিশেষ করে মালিকপক্ষ ও শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তিতে বিজিএমইএ'র কোনো কোনো কর্মকর্তা মালিকপক্ষের কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা গ্রহণের অভিযোগ পাওয়া যায়। আবার শ্রমিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে মালিক বা বিজিএমইএ'র পছন্দনীয় নেতাদেরকে সেলে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বিচারকার্যে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ রয়েছে। যে সব কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন নেই সে সব কারখানায় কোন বিরোধ দেখা দিলে বিরোধ নিষ্পত্তি সেলে বিজিএমইএ'র পছন্দনীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের অর্ন্তভুক্ত করা হয় এবং এসব নেতারা বিজিএমইএ'র স্বার্থ সংরক্ষণ করে থাকে, এ ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগও পাওয়া যায়। একজন বিজিএমইএ কর্মকর্তার ভাষ্য অনুযায়ী, "বিরোধ নিষ্পত্তির দিনে আরবিট্রেশন সেলের চেয়ে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট অনেক বেশি ব্যস্ত থাকে, তাদের হাতে তখন সাদা খাম দেখা যায়"। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিজিএমইএ'র পছন্দনীয় শ্রমিক নেতাদের আর্থিক সুবিধার মাধ্যমে শ্রমিকদের দাবি অবদমিত করার চেষ্টার অভিযোগ রয়েছে।

---

[৩২] "*Garment trade wields power*", The New York Times, 26 July, 2013.

[৩৩] "You can't put the fox in charge of the chickens," said Rizwana Hasan, an environmental lawyer. "BGMEA has no regulatory authority under the laws of the country. It's a clubhouse of the garment industry." source – *Ibid.*

[৩৪] Labour arbitration cells (2), Arbitration Knit (2), Arbitration Sweter (2), Arbitration Woven (3), and Arbitration General (2).

একজন শ্রমিক নেতার ভাষায়, "২০০৬ সালে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে দর কষাকষির ক্ষেত্রে বিজিএমইএ কর্তৃপক্ষ কোনো কোনো পছন্দনীয় শ্রমিক নেতাকে ২ থেকে ৫ লাখ টাকার বিনিময়ে ন্যূনতম মজুরির দাবি থেকে সরে যেতে চাপ প্রয়োগ করে"।

৩.২.৪ নীতি-নির্ধারণ পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রভাব

নব্বই দশক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ব্যবসায়ীদের নির্বাচিত হওয়ার হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।[৩৫] বর্তমান নবম জাতীয় সংসদে ১০% সংসদ সদস্য পোশাক শিল্পের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।[৩৬] কিন্তু বিভিন্ন সূত্র মতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মিলিয়ে (অর্থাৎ সরাসরি কিংবা পরিবারের অপরাপর সদস্য/ নিকটাত্মীয় কেউ না কেউ জড়িত এমনভাবে) হিসেব করলে এই শিল্পের সাথে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রয়েছে এমন সংসদ সদস্যের হার অনেক বেশী হবে। অন্যদিকে, জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ১৮৮ বিধি অনুযায়ী কোনো সংসদ সদস্যের ব্যক্তিগত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকলে সংশ্লিষ্ট কমিটিতে তার না থাকার বিধান রয়েছে। কিন্তু সপ্তম, অষ্টম ও নবম জাতীয় সংসদে বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতের সাথে সরাসরি জড়িত পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সরাসরি তৈরি পোশাক কারখানার মালিক এমন সংসদ সদস্যরা সদস্য ছিলেন।[৩৭] বিভিন্ন কমিটিতে সদস্য হওয়ার কারণে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকে এবং বিভিন্ন নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

- **আইন ও নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রভাব:** তৈরি পোশাক খাতে আইনের সংশোধনের ক্ষেত্রে কারখানা মালিকদের প্রভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়।[৩৮] পোশাক রপ্তানিতে মালিকদের চাপে উৎস করের হার ১.২০ শতাংশ কমিয়ে ০.৮০ শতাংশ করা[৩৯], 'বস্ত্র ও পোশাক শিল্প বোর্ড বিল' প্রণয়নে বাঁধা[৪০] ও 'অ্যাপারেল বোর্ড' গঠনে দীর্ঘসূত্রতা,[৪১] আইন ও নীতি সংস্কারে বিজিএমইএ কর্তৃক লবিইস্টের মাধ্যমে প্রভাবিত করা, বাস্তবে রেশন ব্যবস্থা কার্যকর না থাকলেও সংসদীয় কমিটির প্রতিবেদনে রেশন ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হয়েছে বলে উল্লেখ করা[৪২] ইত্যাদি উল্লেখ করা যায়।

- **সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশ ও ইতিবাচক সংস্কার বাস্তবায়নে প্রভাব:** শ্রম ও কর্মসংস্থান সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি কর্তৃক পোশাক খাত সংশ্লিষ্ট অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ও সংস্কার প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়ন না করা বা বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা অবলম্বনের পেছনে বিজিএমইএ'র প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০০৫-০৬ সালে তৈরি পোশাক খাতে বিভিন্ন অনিয়ম, শ্রমিক নিরাপত্তা ও আনুষঙ্গিক সমস্যাবলি চিহ্নিত করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি কয়েকটি সুপারিশ করে, উল্লেখ্যযোগ্য সুপারিশ ছিল- পৃথক মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা, ঢাকা ও চট্টগ্রামে নিরাপদ দূরত্বে দশটি গার্মেন্টস পল্লি স্থাপন করা, স্বতন্ত্র অধিদপ্তর গঠন, সমন্বিত কোড অফ কন্ডাক্ট প্রণয়ন, কর্মকালীন সময়ে কারখানার গেইট তালাবদ্ধ না রাখা ইত্যাদি।[৪৩] কিন্তু কোনো সুপারিশই পরবর্তীতে বাস্তবায়ন কহয়নি। একইভাবে নবম জাতীয় সংসদে উক্ত স্থায়ী কমিটি কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদপ্তরের বর্তমান জনবলের সাথে আরো ১৯৮৬ জন জনবল বৃদ্ধি করে পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে রূপান্তরিত করার সুপারিশ করে।[৪৪] ২০১০ সালে এ সংক্রান্ত

---

[৩৫] পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম ও নবম সংসদে পেশা হিসেবে ব্যবসায়ী সংসদ সদস্যের হার যথাক্রমে ৩৮%, ৪২.৫%. ৫৮%, ও ৫৭% (সূত্র: টিআইবি, *পার্লামেন্ট ওয়াচ*, ২০১৩)।

[৩৬] *www.bdnews24.com*, 12 January 2009.

[৩৭] নবম জাতীয় সংসদে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিতে ২ জন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিতে ১ জন, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিতে ১ জন সদস্য প্রত্যক্ষ ভাবে তৈরি পোশাক ব্যবসায় জড়িত। অষ্টম জাতীয় সংসদে তৈরি পোশাক কারখানার একজন মালিক মন্ত্রণালয়ের কমিটির সদস্য ছিলেন এবং সপ্তম জাতীয় সংসদে বিজিএমইর প্রাক্তন সভাপতি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ছিলেন। বিস্তারিত দেখুন- *দৈনিক প্রথম আলো*, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১০; www.bdnews24.com, ২৬ জুলাই ২০১৩।

[৩৮] [..."Bangladesh had a golden opportunity," said Roy Ramesh Chandra, a labour leader, who said that the political influence of factory owners diluted some of the amendments. "The employers have tremendous influence,"] source: "*Garment trade wields power*", The New York Times, 26 July, 2013.

[৩৯] ২০০৯-২০১০ অর্থ বছর পর্যন্ত ০.২৫ শতাংশ উৎস কর প্রদান কার হতো, ২০১০-১১ অর্থ বছরে এ হার ১.২০ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে ০.৮০ শতাংশ স্থির করা হয়।

[৪০] বর্তমান সরকারে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ২০১০ সালে 'বস্ত্র ও পোশাক শিল্প বোর্ড' গঠনের জন্য আইনের খসড়া প্রণয়ন করে, কিন্তু ২০১১ সালে তা মন্ত্রীসভায় উত্থাপন করা হলে অনুমদিত হয় নি (বিস্তারিত দেখুন- উক্ত গবেষণা পত্রের অধ্যায় -৪.১৬)। সুত্র- *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৩

[৪১] ১৯৮৯ সালে তৎকালীন সরকার স্বায়ত্বশাসিত 'অ্যাপারেল বোর্ড' গঠনের খসড়া প্রস্তাব অনুমোদন করে, কিন্তু পরবর্তী সরকারগুলো বিষয়টি নিয়ে কার্যকর কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

[৪২] *শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট*, নবম জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, নভেম্বর ২০১২।

[৪৩] *শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট*, অষ্টম জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, সেপ্টেম্বর ২০০৬, পৃষ্ঠা ৭৫-৮৩।

[৪৪] *শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট*, নবম জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, নভেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা ৫৬।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলেও সরকার তা এখনো (অক্টোবর, ২০১৩ পর্যন্ত) বাস্তবায়ন করেনি। বিশেষজ্ঞদের মতে কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে তৈরি পোশাক খাতের দুর্ঘটনা ও অনিয়ম যেমন দূর করা সম্ভব হত তেমনি আন্তর্জাতিক মহলে কারখানা পরিদর্শকদের বর্তমান সংখ্যা নিয়ে (৫৬ জন) সমালোচনার সম্মুখীন হতে হতো না।

- **ব্যক্তিগত মুনাফা ও সুবিধা আদায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যবহার:** গবেষণায় দেখা যায় তৈরি পোশাক কারখানার মালিক সংসদ সদস্য ও রাজনীতিবিদরা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ ও পুনঃতফসিল করে থাকেন। যেমন অষ্টম জাতীয় সংসদে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
- স্থায়ী কমিটির সদস্য একটি বেসরকারি ব্যাংক হতে বকেয়া ঋণ ৩০১.৭ মিলিয়ন টাকা পুনঃ তফসিল করেন। তেমনি একজন প্রাক্তন সংসদ সদস্য সোনালী ব্যাংক হতে ৩.৭৭ বিলিয়ন ঋণ গ্রহণ করেন যার বিপরীতে বন্ধককৃত সম্পদের মূল্য কম ছিল, যা ব্যাংকের পরিভাষায় সন্দেহজনক ঋণ (suspected loan) বলা হয়।[৪৫]

- **অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব:** অনেক পর্যবেক্ষকের মতে ক্ষমতাসীন দলের সাথে সংগতি রেখে বিজিএমইএ'র নেতৃত্বে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ জন্য ক্ষমতাসীন দলের সাথে সম্পৃক্ত নেতাদেরকে গ্রুপের নেতৃত্বে নিয়ে আসা হয়।[৪৬] ফলে জাতীয় রাজনৈতিক পট পরিবর্তিত হলেও বিজিএমইএ'র সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক ও প্রভাব বজায় থাকে। তবে অভ্যন্তরীণ গ্রুপিং-এর কারণে বিজিএমই এর দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজে যেমন বিঘ্ন ঘটে তেমনি বিজিএমইএ কর্তৃক সদস্য কারখানাগুলোর অনিয়মের বিরুদ্ধে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ পাওয়া যায়। যেমন বর্তমান নির্বাচিত গ্রুপের সাথে সুসম্পর্কের কারণে তাজরিন ফ্যাশনের মালিককে বিজিএমইএ বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে। আবার রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে বিজিএমইএ নেতাদের কারখানায় কমপ্লায়েন্স ঘাটতি থাকলেও কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। একটি আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের কমপ্লায়েন্স কর্মকর্তার মতে, "বিজিএমইএ নেতৃস্থানীয় মালিকদের কারখানায় সবচেয়ে বেশি কমপ্লায়েন্স ঘাটতি রয়েছে।"

- **বিজিএমইএ ভবন নির্মাণ ও রক্ষায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রভাব:** ২০১৩ সালে হাতিরঝিল প্রকল্প উদ্বোধনের সময় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বিজিএমইএ ভবন সম্পর্কে নেতিবাচক উক্তি[৪৭] করলেও বাস্তবতা হচ্ছে সোনারগাঁও হোটেলের পাশে বেগুনবাড়ি খালের ওপর ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে বিজিএমইএ'র ১৫ তলা ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী, এবং ২০০৬ সালের অক্টোবরে এই ভবনটি উদ্বোধন করেন পরবর্তী সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী। এই ভবন নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ এনে দায়ের করা মামলার প্রেক্ষিতে ২০১১ সালের ৩ এপ্রিল বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী ও বিচারপতি শেখ মো. জাকির হোসেনের বেঞ্চ পাঁচটি কারণে ভবনটি ভাঙার নির্দেশ দেন: (১) যেখানে ভবনটি নির্মিত হয়েছে সেই জমির নিবন্ধন ছিল না; (২) ভবন নির্মাণের আগে রাজউকের অনুমোদন নেওয়া হয়নি; (৩) জলাধার সংরক্ষণ আইন-২০০০ লঙ্ঘন করা হয়েছে; (৪) এই ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে নগর উন্নয়ন আইন-১৯৫৩ মানা হয়নি; এবং (৫) ভবন নির্মাণ আইন-১৯৫২ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হয়েছে।[৪৮] মহামান্য হাইকোর্ট তাঁর রায়ে বলেন, "... এই উচ্চ ভবনটি দেশের প্রচলিত আইনের কোন বিধি-বিধান এর তোয়াক্কা না করিয়া সংশ্লিষ্ট কোন কোন কর্তৃপক্ষের সহিত আঁতাত করিয়া, কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে ভুল বুঝাইয়া ও প্রভাব খাটাইয়া মালিকানা না থাকা সত্ত্বেও নির্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, যাহা সম্পূর্ণরূপে বেআইনী ও জনস্বার্থের পরিপন্থী।"[৪৯] রায়ে বিচারক দ্ব্যর্থহীনভাবে সিদ্ধান্ত দেন যে, বিজিএমইএ কর্তৃপক্ষ ভবনটির নকশা, পরিকল্পনা ও নির্মাণের ক্ষেত্রে রাজউক থেকে যথাযথ অনুমতি নেয়নি এবং যে পদ্ধতিতে বিজিএমইএ জমিটির দখল নিয়েছে তা প্রতারণামূলক এবং একই কারণে তা ক্রিমিনাল অফেন্স।[৫০] রায়ে আরও বলা হয়, জমির মালিকানা জেলা প্রশাসনকে ফিরিয়ে দিতে হবে এবং জেলা প্রশাসন জনগণের ব্যবহারের জন্য জমিটির বন্দোবস্ত নিশ্চিত করবেন।

---

[৪৫] বিস্তারিত দেখুন www.dhakatribute.com, ১৯ জুন ,২০১৩।

[৪৬] বিজিএমইএ'র পরিচালনা বোর্ড প্রতি দুই বছরের জন্য সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে থাকে। উক্ত নির্বচনকে কেন্দ্র করে বিজিএমইএ'র সদস্যদের মধ্যে দুইটি গ্রুপ বিদ্যমান - 'ফোরাম' ও 'সম্মিলিত পরিষদ'।

[৪৭] প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ঢাকা শহরের বিষফোঁড়া হচ্ছে বিজিএমইএ ভবন", সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ৩ জানুয়ারি ২০১৩।

[৪৮] 1 CLR (2013), (AD):1 CLR (2013) (HCD) etc.

[৪৯] *Ibid*

[৫০] রায়ে বলা হয়, "BGMEA, we must iterate, acted in the most decadent, disdainful and imperious manner by pretending that its members' stentorian economic muscle place them with supra legal status. They have, raised a building on the government land, effectively frustrating the long cherished Hatirjheel Project. The very presence of the building shows that conglomerate of financially affluent people can scorn and unravel our law with impunity in a nauseating manner. Such a view is simply repulsive to notion of justice....." সূত্র: 1 CLR (2013), (AD):1CLR(2013) (HCD)etc ।

৩.৩ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর

আইএলও কনভেনশন নং ৮১ (Labour Inspection Convention) অনুযায়ী শিল্পক্ষেত্রে কার্যকর শ্রম-পরিদর্শন কার্যক্রম গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৭০ সালে শ্রম পরিদপ্তর হতে বিভক্ত হয়ে স্বতন্ত্র সংস্থা হিসেবে 'কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর' প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত শ্রমিক কর্মচারীর অধিকার, কাজের শর্তাবলি, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত আইনানুগ বিধানাবলীর যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব এই পরিদপ্তরের। পরিদপ্তরটি শিল্প কারখানা অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণে সরকারের প্রধান তদারকি সংস্থা হিসেবে কাজ করে। তৎকালীন সময়ের শিল্পায়নের অগ্রগতি ও একটি প্রদেশের শিল্পায়ন বিবেচনা করে গঠিত পরিদপ্তরটিতে বর্তমান স্বাধীন দেশে একুশ শতকের দ্রুত বর্ধনশীল শিল্পায়ন উপযোগী জনবল, প্রশাসনিক, অবকাঠামোগত ও লজিস্টিক সক্ষমতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে কমপ্লায়েন্স ইস্যুটি দেখার একমাত্র সরকারি কর্তৃত্বপূর্ণ এ পরিদপ্তরটি যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরের প্রধান কার্যক্রম হচ্ছে:[৫১]

- বাংলাদেশ শ্রম-আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী শ্রমিকদের নিয়োগ সংক্রান্ত শর্তাবলি, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি, শ্রম কল্যাণ, মজুরি পরিশোধ, কাজের সময় নির্ধারণ, ছুটি ইত্যাদি বিষয় তদারকি ও বাস্তবায়নের জন্য কল-কারখানা, দোকান, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, চা-বাগান, রেলওয়ে, অভ্যন্তরীণ নৌ ও সড়ক পরিবহণ প্রভৃতি পরিদর্শন করা;
- কারখানা নির্মাণ, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের নকশা অনুমোদন করা;
- কারখানা নিবন্ধন সনদপত্র প্রদান ও নবায়ন করা;
- আইন অমান্যকারী মালিক/ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু করা;
- শ্রমিকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ তদন্ত করে আইনানুগভাবে নিষ্পত্তি করা;
- শ্রম পরিদর্শন, মজুরি, কাজের পরিবেশ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থার জরিপ প্রতিবেদন তৈরি সংক্রান্ত কাজে সাহায্য করা;
- শ্রম আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা, মালিক সমিতি ও ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং শ্রম-আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা।

নিচে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরে তৈরি পোশাক খাত সংক্রান্ত সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ে আলোচনা করা হল।

৩.৩.১ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অভাব

- **অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা:** ঢাকায় অবস্থিত সদর দপ্তর, চারটি বিভাগীয় দপ্তর (ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী), চারটি আঞ্চলিক দপ্তর এবং ২৩টি শাখা অফিসের মাধ্যমে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর ৩১টি জেলায় তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। স্বাধীনতার পর দেশের প্রায় প্রতিটি জেলা সদরে বিসিক শিল্প নগরীসহ বিভিন্ন স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, অথচ ৩৩টি জেলাতে পরিদপ্তরের অফিস নেই । অপরদিকে ৩২টি জেলা সদরের মধ্যে ২৪টি কার্যালয়ের অফিস ভাড়া বাড়িতে পরিচালিত হয়। প্রধান অফিসসহ শাখা অফিসগুলোতে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ডাটাবেজ বা আইসিটি সামর্থ্য নেই। ফলে প্রধান কার্যালয়সহ সকল কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোন ডিজিটাল প্রযুক্তি (আইসিটি) ব্যবহৃত হয় না। দাপ্তরিক নথিপত্র সনাতন পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়। সঠিক ব্যবস্থাপনা না থাকার কারণে দেশে মোট কয়টি কলকারখানা রয়েছে সে তথ্যটিও পরিদপ্তরটিতে নেই।

- **প্রধান কার্যালয়ে স্থানের অভাব:** ঢাকাস্থ শ্রম-ভবনে শ্রম পরিদপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর, তিনটি শ্রম আদালত, শ্রম আপিল আদালত, নিম্নতম মজুরি বোর্ড অবস্থানের কারণে স্থানের স্বল্পতা অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়, যে কারণে কাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

- **অপর্যাপ্ত জনবল কাঠামো:** প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ চার দশক পরও পরিদপ্তরের অবকাঠামো ও জনবলের তেমন কোন পরিবর্তন হয় নি। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পোশাক শিল্পসহ নানা শিল্পকারখানা গড়ে ওঠে। কিন্তু শিল্পায়নের এ অগ্রগতির সাথে সমন্বয় রেখে প্রতিষ্ঠানটির জনবল, প্রশাসনিক, অবকাঠামোগত ও লজিস্টিক সাপোর্টে ইত্যাদি সক্ষমতা বৃদ্ধি পায় নি। ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠালগ্নে সর্বমোট ২০৪ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়ে পরিদপ্তরটির কার্যক্রম শুরু হয়।বর্তমানে জনবল খুব অল্প পরিবর্তিত হয়ে ৩১৪ জনে উন্নীত হয়েছে, এর মধ্যে ১৮৩ জন পরিদর্শক এবং ১৩১ জন সহায়ক কর্মচারী। এ সকল পরিদর্শক ২ ভাগে বিভক্ত- (১) কারখানা পরিদর্শক এবং (২) দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক । বর্তমানে মঞ্জুরিকৃত ১০৩ জন কারখানা

[৫১] বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১০-২০১১, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ-৩৩-৩৪।

পরিদর্শকদের মধ্যে ৫৬ জন এবং ৮০ জন দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শকদের মধ্যে ৩৯ জন কর্মরত রয়েছেন। সম্প্রতি তাজরিন অগ্নিকাণ্ড ও রানা প্লাজার দুর্ঘটনার পরবর্তীতে কর্মরত কারখানা পরিদর্শকদের মধ্য হতে ৭ জন পরিদর্শককে দায়িত্বে অবহেলা ও অনিয়মের কারণে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়।

রাজধানীসহ ঢাকা বিভাগে পরিদর্শনের জন্য ৩৬টি পদের বিপরীতে বর্তমানে পরিদর্শক রয়েছেন ২২ জন। অথচ ঢাকা অঞ্চলে শুধু বিজিএমইএ ও বিকেএমই-এর সদস্য রয়েছে যথাক্রমে প্রায় ৫৪০০টি[৫২] ও ১৯২০টি[৫৩]। রাজধানীতে অবস্থিত পরিদপ্তরের অনুমোদিত বিভিন্ন ধরনের ১৭০০০[৫৪] কারখানার জন্য গড়ে একজন পরিদর্শককে ৭৭২টির অধিক কারখানা তদারকি করতে হয়। এটা প্রয়োজনের তুলনায় 'নিতান্ত অপর্যাপ্ত'[৫৫]। আবার ঢাকার আশপাশে সাভার, আশুলিয়া, মানিকগঞ্জ, ধামরাই, গাজীপুর অঞ্চলে দেশের অধিকাংশ তৈরি পোশাক কারখানা গড়ে উঠেছে অথচ এ সব অঞ্চলে পরিদপ্তরের কোনো শাখা নেই। ঢাকার একজন কারখানা পরিদর্শকের ভাষ্য অনুযায়ী, "সারাজীবন যদি ডেস্কে বসে সার্টিফিকেট নবায়নের কাজ করি, তাতেই চাকুরি জীবন কেটে যাবে, অফিসও কিছু বলতে পারবে না এবং ইনকামও কম হবে না"।

দেশের বর্তমান শিল্পকারখানা ও শ্রমিকের অনুপাতে মঞ্জুরিকৃত পরিদর্শকের সংখ্যা খুবই নগণ্য বলা চলে। বিশেষকরে কোনো কোনো শিল্প-অঞ্চলে কারখানা পরিদর্শকের পদায়ন খুবই অল্প। যেমন, নারায়ণগঞ্জ স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই শিল্প নগরী হিসেবে খ্যাত, কিন্তু এ অঞ্চলে একজন মাত্র শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) ও একজন দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শকের পদ পদায়ন করা হয়েছে। আবার অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিল্প নগরীতে শাখা অফিস থাকলেও কারখানা পরিদর্শকের পদ দেওয়া হয়নি। যেমন, সিলেট, বরিশাল, কুষ্টিয়া, টাঙ্গাইল, নোয়াখালী, সৈয়দপুর, রাজশাহী শাখা অফিস এ কারখানা পরিদর্শকের পদায়ন নেই, এসব শাখা অফিসে শুধু দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শকের পদায়ন করা হয়েছে।[৫৬]

পরিদর্শনের ধরন অনুযায়ী কারখানা পরিদর্শকগণ পাঁচ ভাগে বিভক্ত - পরিদর্শক সাধারণ, পরিদর্শক প্রকৌশল, পরিদর্শক মেডিকেল, শ্রম পরিদর্শক সাধারণ।[৫৭] এছাড়া পরিদর্শক (স্থায়ী আদেশ) নামে সদর দপ্তরে একটি পদায়ন রয়েছে। সদর দপ্তর ও বিভাগীয় চারটি অফিসে চার ধরনের (সাধারণ, মেডিকেল, প্রকৌশল ও শ্রম পরিদর্শক) পরিদর্শকের পদায়ন রয়েছে, কিন্তু আঞ্চলিক অফিসগুলোতে শুধুমাত্র শ্রম পরিদর্শক এবং শাখা অফিসে শুধু দোকান পরিদর্শকের পদায়ন করা হয়েছে। পদায়নের শ্রেণিবিন্যাস হতে দেখা যায় দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিল্প কারখানা গড়ে উঠলেও কলকারখানা পরিদপ্তরের কার্যক্রম বিভাগীয় দপ্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনে এক ধরনের উদাসীনতা লক্ষ করা যায়।

- **পরিদর্শকদের যোগ্যতার ঘাটতি:** কাজের ধরন ও পরিদর্শনের বিষয়কে ভিত্তি করে পরিদর্শকদের মধ্যে বিশেষায়িত করা হয়েছে। কিন্তু গবেষণায় দেখা যায় এ সকল পরিদর্শকদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন বিশেষায়িত জ্ঞান নাই। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘাটতি রয়েছে। যেমন 'পরিদর্শক মেডিকেল'দের মধ্যে মাত্র ২ জনের এমবিবিএস ডিগ্রি রয়েছে, অন্যদের স্বাস্থ্য বিষয়ক কোন ডিগ্রি নেই। তেমনি 'পরিদর্শক প্রকৌশল'দের অনেকের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডিপ্লোমা ডিগ্রি নেই আবার শুধু মাত্র এসএসসি বা এইচএসসি ডিগ্রি পাশ করে অনেকে পরিদর্শক (শ্রম, সাধারণ) পদে কর্মরত রয়েছেন। কর্মরত জনবলের সক্ষমতার অভাব ও আধুনিক শিল্পায়ন প্রযুক্তি ও বৈশ্বিক মানদণ্ড সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকার কারণে পরিদর্শকদের পক্ষে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শিল্প মালিকদের সাথে নিত্য নতুন সমস্যা সমাধানে অনেক ক্ষেত্রে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

- **প্রশিক্ষণের অভাব:** কারখানা পরিদর্শকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বা বিভাগীয় প্রশিক্ষণ নিয়মিত নয়। আই.এল.ও কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন কনভেনশন ও মানদণ্ড বিষয়ক কিছু প্রশিক্ষণ মাঝে মাঝে পরিদর্শকরা পেয়ে থাকেন।

---

[৫২] www.bgmea.com.bd viewd on 18th July, 2013

[৫৩] www.bkmea.com.bd viewd on 18th July, 2013

[৫৪] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৭ জুলাই ২০১৩।

[৫৫] আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) মহাপরিচালক গাই রাইডার বাংলাদেশের দুর্যোগপ্রবণ পোশাক খাতের জন্য কলকারখানা পরিদর্শন পরিদপ্তরের বর্তমানে কর্মরত পরিদর্শক সংখ্যাকে 'নিতান্তই অপর্যাপ্ত' বলে আখ্যায়িত করেন এবং পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দ্রুত ও জরুরি ভিত্তিতে কয়েকশ কারখানা পরিদর্শক নিয়োগ দিতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানান । সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩ মে ২০১৩।

[৫৬] শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, *বাৎসরিক প্রতিবেদন, ২০১০-২০১১*, পৃষ্ঠা ৩৪-৩৬।

[৫৭] 'পরিদর্শক সাধারণ' প্রশাসনিক ও কারখনার সার্বিক বিষয়সমূহের মানদণ্ড তদারকি করে থাকেন, 'পরিদর্শক মেডিকেল' কারখানার স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ, 'পরিদর্শক প্রকৌশল' টেকনিকাল ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় সমূহ এবং 'শ্রম পরিদর্শক' কারখানার শ্রম মান ও শ্রম পরিবেশ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নিশ্চিতকল্পে তদারকি দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

- **লজিস্টিক সাপোর্ট:** একটি অফিসের আওতাধীন এলাকা অনেক বেশি এবং দূরবর্তী হওয়ার কারণে পরিদর্শকরা রুটিন মাফিক পরিদর্শন কাজ পরিচালনা করতে উৎসাহিত হন না। নিজস্ব গাড়ি অথবা মোটরসাইকেল না থাকার কারণে পরিদর্শন কাজ ব্যাহত হয় বলে পরিদর্শকগণ মতামত ব্যক্ত করেন। তেমনি, নথিপত্র সংরক্ষণের জন্য কম্পিউটার, আইসিটি সুবিধা, পর্যাপ্ত চেয়ার টেবিল ও আলমারির স্বল্পতার কারণে নথিপত্র সংরক্ষণে অব্যবস্থাপনা পরিলক্ষিত হয়।

- **পরিদর্শন নীতিমালার অভাব:** পরিদর্শকগণ শ্রম আইনানুসারে তাদের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। কিন্তু পরিদর্শনে মানদণ্ড কী হবে এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য শ্রম-আইনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, বায়ু চলাচল ও তাপমাত্রা সহনীয় মাত্রায় রাখার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে নির্দিষ্ট মানদণ্ড ও নীতিমালা না থাকার কারণে কারখানা মালিকগণ যেমন সুবিধা নেন তেমনি পরিদর্শকগণও ব্যক্তিগত সুবিধা গ্রহণ করেন।
  তৈরি পোশাক কারখানার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে একটি চেকলিস্ট প্রতিবছর পাঠানো হয়, যার ওপর ভিত্তি করে পরিদর্শকরা তথ্য সংগ্রহ করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে জমা দেন। এর ভিত্তিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কারখানাগুলোকে এ, বি, সি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করে। তবে কারখানাগুলো কমপ্লায়েন্স মেনে চলছে কি না তার ওপর কোনো তথ্য এ চেকলিস্টের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয় না। অপরদিকে পরিদর্শকদের কারখানা পরিদর্শন প্রতিবেদন দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের কার্যকর কাঠামোর অনুপস্থিতির কারণে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় না।

- **নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতিতে সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম:** প্রধান কারখানা পরিদর্শক একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য প্রশাসন ক্যাডার হতে প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। এ ধরনের নিয়োগের ফলে স্বল্পমেয়াদে পরিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও কাজের ধরনের সাথে প্রধান পরিদর্শকের যেমন দক্ষতা তৈরি হয় না, তেমনি প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক গৃহীত প্রশাসনিক সংস্কার-কর্মসূচি দীর্ঘমেয়াদে টেকসই হয় না এবং পরিদপ্তরের ব্যর্থতার দায় কেউ গ্রহণ করে না, যা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে পরিগণিত হয়।
  অপরদিকে পরিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তাদের পদ বিন্যাস কাঠামো স্বল্প। যার কারণে একজন কর্মকর্তাকে দীর্ঘসময় একই পদে দ্বায়িত্ব পালন করতে হয়। যখন পদোন্নতির সুযোগ আসে তখন রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষমতার ব্যাবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন হয়। দেশের বেশিরভাগ কারখানা ঢাকায় অবস্থিত যে কারণে ঢাকা প্রধান কার্যালয় এবং ঢাকা বিভাগীয় দপ্তরে কোনো পদ শূন্য হলে অন্য জেলা থেকে সেখানে আসার জন্য পরিদর্শকরা সচেষ্ট থাকে। এ ক্ষেত্রে কেউ কেউ রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষমতা ব্যবহার করে থাকে। ঢাকার একজন কারখানা পরিদর্শক মন্তব্য করেন, "ঢাকায় বদলি হয়ে আসতে যদি লাখ টাকা খরচ হয়, তা আসার কিছুদিনের মধ্যে তোলা সম্ভব, কিন্তু ঢাকার বাইরে বছরের পর বছর পড়ে থেকে লাভ কী?"

৩.৩.২ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরে বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন:

- **টাকার বিনিময়ে কারখানা নিবন্ধন:** বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩ মোতাবেক কলকারখানা কর্তৃপক্ষকে কারখানা নির্মাণ বা সম্প্রসারণে নিবন্ধন গ্রহণ বা নবায়নের জন্য প্রধান পরিদর্শক/উপ-প্রধান পরিদর্শক এর বরাবর প্রয়োজনীয় কাগজ/দলিল-পত্রসহ[৫৮] আবেদন করতে হয়। আবেদন প্রাপ্তির দুইমাসের মধ্যে সনদ প্রদানের বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে হয় এবং ইস্যুকৃত সনদসমূহ প্রতি বছর ৩১ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে নবায়ন করতে হয়। বিভিন্ন মুখ্য তথ্যদাতার মতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরে নির্দিষ্ট সনদ ও নবায়ন ফি'র জন্য অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হয়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে গরমিল বা ঘাটতি থাকলে অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ বেশি হয়। ঢাকার একজন তৈরি পোশাক কারখানা মালিকের ভাষ্য অনুযায়ী, "কারখানা নিবন্ধনের সনদ পেতে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা এবং নবায়নের ক্ষেত্রে ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা অতিরিক্ত দিতে হয়"। কারখানার মালিক দ্রুত কারখানা স্থাপন, অযাচিত বাধা থেকে পরিত্রান এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও সহজ ও সাবলীল প্রক্রিয়ায় নিবন্ধন প্রাপ্তির জন্য এরকম অবৈধ লেনদেনকে স্বাভাবিক মনে করে। উল্লেখ্য, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর কারখানা নিবন্ধন ও নবায়নের আবেদন অন-লাইনে করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- **সরেজমিন পরিদর্শন না করে সনদ প্রদান:** আইন অনুযায়ী কারখানা নিবন্ধন ও নবায়ন সনদ প্রদান করার ক্ষেত্রে পরিদর্শন করার কথা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে কারখানা পরিদর্শন না করে অফিসে বসেই সনদ প্রদান করেন। ফলে নতুন কারখানা স্থাপন বা পুরানো কারখানা সম্প্রসারণ ও কারখানা ভবনের পরিবর্তন সাধিত হলেও পরিদর্শন না করার কারণে অনেক ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে স্থাপিত কারখানার লাইসেন্স/ নবায়ন প্রদান করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে কারখানা মালিক ও পরিদর্শকের মধ্যকার অবৈধ সমঝোতা নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। ঢাকার একজন তৈরি পোশাক কারখানা মালিক মন্তব্য করেন,

[৫৮] কারখানা নিববন্ধনের আবেদন পত্রের সাথে ট্রেড লাইসেন্স, উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রবাহ তালিকা, মালিকানা স্বত্ব/জমির দলিল/চুক্তিনামা/খতিয়ান; মেমোরাণ্ডাম অব আর্টিকেল; কোম্পানি নিবন্ধন সনদ; নির্মাণ নক্সা (ফ্লোর প্লান, সেকশন এলিভেশন প্লান, মেশিন লে আউট প্লান, লোকেশন ম্যাপ); বিনিয়োগ বোর্ডের নিবন্ধন সনদ ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র জমা দিতে হয়।

"আমার ফ্যাক্টরি বিগত ১৬ মাস যাবৎ কেউ পরিদর্শন করেনি অথচ সনদ নবায়ন ঠিকই করেছি - অবশ্য অল্প কিছু টাকা প্রদান করতে হয়েছে"।

- **অনিয়মিত পরিদর্শন:** নির্ধারিত কাজের ব্যাপ্তি ও জনবল ঘাটতির কারণে পরিদপ্তর সুচারুভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারে না। বিশেষ করে কারখানা সরেজমিন পরিদর্শন, কর্মমান ও শ্রম অধিকার নিশ্চিত করার তদারকি কার্য পরিচালনায় জনবল ও লজিস্টিক সাপোর্টের অপর্যাপ্ততার অজুহাতে পরিদর্শকরা যেমন অফিসে বসে কাজ করতে সাচ্ছন্দ্য বোধ করে তেমনি কারখানা মালিকরাও কারখানার অনিরাপদ ও অস্বাস্থ্যকর কর্ম-পরিবেশ লোকচক্ষুর আড়ালে রেখে প্রয়োজনীয় সনদ ও সেবা গ্রহণ করতে আগ্রহী থাকে। ঢাকার একজন তৈরি পোশাক কারখানা মালিকের ভাষ্য অনুযায়ী, "পরিদর্শক কারখানা সরেজমিনে পরিদর্শনে আসলে খরচ বেশি দিতে হয় এবং অনেক দিন লাগে সিডিউল পেতে, অথচ আমাদের সনদটি তাড়াতাড়ি দরকার। এজন্য অফিসে চলে যাই, খরচও কম হয় আর পরিদর্শককেও কষ্ট করে আসতে হয় না"।

- **কারখানা নিবন্ধন ছাড়া ব্যবসা পরিচালনা:** কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদপ্তর কর্তৃক জ্ঞাত অনিবন্ধিত কারখানাগুলো বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। যেমন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর থেকে ইথারটেক্স নামে রানা প্লাজায় অবস্থিত পোশাক কারখানাটি কোনো সনদ নেয়নি। অথচ পরিদপ্তর হতে রানা প্লাজায় অবস্থিত কারখানাগুলো বিভিন্ন সময় পরিদর্শন করা হলেও নিবন্ধনহীন এ কারখানার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এমনকি ভবনটিতে ফাটল দেখা দেওয়ার পর কলকারখানা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।[৫৯] নিবন্ধনহীন কারখানা পরিচালনায় পরিদর্শকদের শৈথিল্য কিংবা অপ্রকাশিত সমঝোতার বিষয়টি এ ক্ষেত্রে নির্দেশ করে।

- **সক্ষমতার ঘাটতি ও যন্ত্রপাতি স্থাপন নকশা (Floor Plan) অনুমোদনে অনিয়ম:** নতুন কারখানা স্থাপন, সম্প্রসারণ ও কারখানা ভবনের পরিবর্তন করতে হলে যন্ত্রপাতি স্থাপন নকশার (ফ্লোর প্লান) অনুমোদন কলকারখানা পরিদর্শন পরিদপ্তর হতে গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু পরিদপ্তরে কর্মরত পরিদর্শকদের অনেকেরই মেশিন সংক্রান্ত (যেমন মেশিনের আকৃতি, ধরন, বৈদ্যুতিক লোড ক্যাপাসিটি) ও ভবনের ধারণ ক্ষমতা ও ব্যবহৃত মেশিনের কম্পন অনুপাত এবং নিত্য-নতুন আবিষ্কৃত মেশিন সম্পর্কে বিশেষায়িত ধারণা থাকে না। এছাড়া এ সংক্রান্ত টেকনিক্যাল ট্রেনিং না থাকার কারণে পরিদর্শকরা মেশিনের গুণগত মান ও সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে না জেনে মেশিনের সংখ্যা ও ধরন এবং কারখানার আয়তনের ওপর ভিত্তি করে 'নির্দিষ্ট অংকের'[৬০] টাকার বিনিময়ে কারখানার ফ্লোর সেটআপ ছাড়পত্র প্রদান করে থাকে। । এরকম ছাড়পত্র প্রদানের ফলে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। যেমন, কোনো কারখানায় যে পরিমাণ ভোল্টেজের বৈদ্যুতিক সংযোগ রয়েছে, তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি ক্যাপাসিটির মেশিন স্থাপনের ফলে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট হতে পারে যা অগ্নি দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ বলে তথ্যদাতারা মনে করেন। তেমনি অনেক কমপ্লায়েন্ট কারখানার ভবনের ওপরের তলায় জেনারেটর স্থাপনের ফলেও ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। সাভারের রানা প্লাজায় ভবনের তিনটি তলায় জেনারেটর ছিল; দুর্ঘটনা-পরবর্তী তদন্তে জেনারেটর হতে সৃষ্ট কম্পন ভবন ধ্বংসের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অথচ এসব কারখানা পরিদর্শক কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়েছিল। ঢাকার একটি কারখানার ব্যবস্থাপকের মতে, "কারখানার টেকনিক্যাল নকশা অনুমোদনে কারখানা পরিদর্শক যেমন মোট কয়টি মেশিন বসানো হয়েছে এবং মেশিনের ধরন কী এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দেন- এই হারে সব মিটমাট হয়ে যায়"।

- **পরিদর্শক কর্তৃক রেজিস্টার খাতা পরিবীক্ষণ না করা:** আইন অনুযায়ী একটি কারখানায় বিভিন্ন ধরনের প্রায় ১২টি[৬১] রেজিস্টার খাতা সংরক্ষণ করতে হয়। কারখানা পরিদর্শনকালে পরিদর্শকরা এসব রেজিস্টার খাতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে ছাড় দিয়ে থাকে।

৩.৪ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)

তৈরি পোশাক কারখানার ভবন নির্মাণ অনুমতি ও নির্মাণ নকশা অনুমোদনের সাথে রাজউক জড়িত। ঢাকা মহানগর নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ বিধিমালা, ২০০৮এর ৩ (১) ধারায় বলা হয়েছে, অন্য আইনে যা-ই থাকুক না কেন, রাজউকের দায়িত্বশীল কর্মকর্তার পূর্বানুমোদন ছাড়া কোনো ভবন নির্মাণ, পুনঃর্নির্মাণ, সংযোজন বা পরিবর্তন করা যাবে না। সে অনুসারে রাজউক এলাকায় যেকোনো স্থাপনার কাঠামোগত ভালো-মন্দ দেখ-ভাল করার কর্তৃপক্ষ হচ্ছে রাজউক। আবার ক্রমবর্ধমান নগরায়ন ও রাজধানীর উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে রাজউক কর্তৃক ১৯৯৫ সালে 'ঢাকা মহানগর উন্নয়ন পরিকল্পনা ১৯৯৫-২০১৫' (Dhaka Metropolitan Development Plan - DMDP, 1995-2015) গ্রহণ করা হয়। ৫৯০

---

[৫৯] *দৈনিক সমকাল*, ২৮ আগস্ট, ২০১৩।

[৬০] তথ্যদাতাদের মতে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার হারটি নির্ধারিত হয় মেশিনের ধরণ ও সংখ্যার অনুপাতে।

[৬১] হাজিরা খাতা; বেতন বই; ওভারটাইম বই; ছুটি রেজিস্ট্রার; শ্রমিক শ্রেণির বিন্যাস রেজিস্ট্রার; দুর্ঘটনা ও বিপদজ্জনক দুর্ঘটনার রেজিস্ট্রার; অগ্নি নির্বাপন মহড়া রেজিস্ট্রার; মাতৃত্ব কল্যাণ রেজিস্ট্রার; বয়স্ক শ্রমিক রেজিস্ট্রার; পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা রেজিস্ট্রার; বার্ষিক/অর্ধ বার্ষিক রিটার্ন ফরম; সার্ভিস বুক ইত্যাদি।

বর্গ মাইল জুড়ে বিস্তৃত এই উন্নয়ন পরিকল্পনা তিনটি ধাপে বিভক্ত - ১) কাঠামোগত নকশা (Structural Plan - SP), ২) নগর এলাকা নকশা (Urban Area Plan - UAP), ৩) বিস্তৃত এলাকা নকশা (Detailed Area Plan - DAP)। ইউএপি অনুসারে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, নারায়ণগঞ্জ, জিনজিরা, উত্তরা, টঙ্গী, সাভার, ধামরাই ডিএমডিপি'র আওতাভুক্ত। এসব এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির দায়িত্বও রাজউকের (সোহাগ, ২০১৩)। ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে চারটি ছাড়পত্র রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ থেকে গ্রহণ করতে হয়[৬২]। বাস্তবে দেখা যায়, ইমারত মালিকরা শুধুমাত্র নির্মাণ অনুমোদন পত্র ও ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র গ্রহণ করেন; কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিল্প ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য অন্য দুটি সনদ (বিশেষ উন্নয়ন/ প্রকল্প ছাড়পত্র ও নির্মাণ অনুমোদন পত্র) গ্রহণ করা হয় না। সাম্প্রতিক সময়ে রানা প্লাজা দুর্ঘটনা তদন্তে বিজিএমইএ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্ত প্রতিবেদনে ভবন নির্মাণে অনুমতি ও তদারকির জন্যে সাভার পৌরসভা কর্তৃপক্ষকে এবং নিয়মিত তদারকি না করা, ভবন নির্মাণের মান ও মাটি পরীক্ষা ইত্যাদিতে অবহেলার জন্যে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষেকে দায়ী করা হয়।[৬৩]

৩.৪.১. রাজউক কর্তৃক কারখানা নির্মাণ নকশা অনুমোদন ও তদারকির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন:

- **জনবল ঘাটতি:** ড্যাপ অনুযায়ী ঢাকা শহরের বাইরে সাভার, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ রাজউকের আওতাভুক্ত করা হলেও সে অনুযায়ী জনবল বৃদ্ধি করা হয়নি। বর্তমানে মঞ্জুরিকৃত ১৫৭ জন কর্মকর্তা কর্মচারীর বিপরীতে ১১৭ জন কর্মরত রয়েছেন। এবং রাজউকের পরিদর্শন কাজে বর্তমানে মাত্র ১৫ জন পরিদর্শক কর্মরত। রাজউক আওতাভুক্ত ৫৯০[৬৪] বর্গমাইল এলাকার সকল ইমারত পরিদর্শন এবং পরিবীক্ষনের জন্য এ সংখ্যা অত্যন্ত কম বলে পরিগনিত হয়।

- **ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদানে অনিয়ম:** রাজউক-এর ভূমি ব্যবহার অনুমোদন প্রক্রিয়া জটিল, দীর্ঘমেয়াদি ও ঝামেলাপূর্ণ হওয়ার কারণে দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়। রাজউক কর্তৃক সেবা গ্রহণে অযথা হয়রানি, অতিরিক্ত সময়ক্ষেপণ, ইচ্ছাকৃতভাবে ফাইলপত্র লুকিয়ে ফেলা, ফাইলের ওপর অযৌক্তিক আপত্তি উত্থাপন রাজউকের অনুমোদন শাখার নিয়মিত ঘটনা (আকতার , ২০০৭) এ সকল জটিলতা এবং দীর্ঘসূত্রিতার কারনে ভবন মালিকরা এ কাজটি বিভিন্ন 'প্যাকেজের' মাধ্যমে করতে বাধ্য হন। রাজউকের একজন কর্মচারীর ভাষ্য অনুযায়ী, "অধিকাংশ আবেদনকারী ৩০ হতে ৩৫ হাজার টাকা প্যাকেজে কাজটি করান"।

- **নকশা অনুমোদনে অনিয়ম:** তথ্যদাতাদের মতে নকশা অনুমোদনের বিভিন্ন পর্যায়ে ঘুষ ও তদবির ছাড়া নির্মাণ নকশা অনুমোদন করা যায় না। যেমন, একটি কারখানা ভবনের নকশা অনুমোদনে আটটি পর্যায়ে ১ লাখ ২৪ হাজার হতে ৩ লাখ ৫৪ হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে হয়। উল্লেখ্য, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর মন্ত্রীসভা পর্যায়ে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয় বেশিরভাগ তৈরি পোশাক কারখানার মৃত্তিকা পরীক্ষা প্রতিবেদন নেই এবং নকশা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নয়[৬৫]। অথচ এটি নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাজউকের।

সারণি ২: নির্মাণ নকশা অনুমোদনে রাজউক কর্তৃক আটটি পর্যায়ে নিয়ম বহির্ভূত অর্থ আদায়ের পরিমাণ

পর্যায়	নিয়ম বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
আবেদন জমাদান	৩,০০০ থেকে ৫,০০০
নকশাকার (ভূমি ব্যবহার সনদের সাথে সত্যতা যাচাই)	৩,০০০ থেকে ৫,০০০
পরিদর্শক (সরেজমিন পরিদর্শন)	৫,০০০ থেকে ১৫,০০০
প্রধান পরিদর্শক	৫,০০০ থেকে ১৫,০০০
সহ অনুমোদনকারী কর্মকর্তা	৫,০০০ থেকে ১০,০০০
অনুমোদনকারী কর্মকর্তা	১,০০,০০০ থেকে ৩,০০,০০০
নকশা অনুমোদনকারী বোর্ড (চার সদস্যবিশিষ্ট)	
ইস্যুকার (অনুমোদনকৃত নকশা হস্তান্তর)	৩,০০০ থেকে ৪,০০০

তথ্যসূত্র: সংশ্লিষ্ট মুখ্য তথ্যদাতা।

[৬২] Building construction Act 1952 (Act No. 11. 1953) এর Section 18 এর ক্ষমতাবলে প্রণীত ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৮ অনুসারে ছাড়পত্র চারটি হচ্ছে- (ক)ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র (Land use clearence) [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে] (খ)বিশেষ উন্নয়ন/ প্রকল্প ছাড়পত্র (Special project permit for large and specialized projects) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) (গ)নির্মাণ অনুমোদন পত্র (Building Permit) [বাধ্যতামূলক] এবং (ঘ) বসবাস ও ব্যবহার সনদপত্র (Occupancy certificate) [বাধ্যতামূলক]।

[৬৩] দৈনিক প্রথম আলো, ২৭ মে ২০১৩, ২৮ জুন ২০১৩, ৩০ জুলাই ২০১৩ এবং http://www.bbc.co.uk/bengali/, ২৬ জুন ২০১৩।

[৬৪] http://www.rajukdhaka.gov.bd access on 24 October, 2013

[৬৫] রানা প্লাজা দূর্ঘটনা পরবর্তী মন্ত্রিসভা কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন, সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩।

- **নির্মাণ তদারকিতে অনিয়ম:** নির্মাণ বিধিমালা অনুযায়ী ইমারত নির্মাণ হচ্ছে কিনা তা ওয়ার্কিং ড্রয়িং-এর সাথে পরিদর্শন করে মূল্যায়ন করার কথা। অথচ পরিদর্শন বা বিশেষজ্ঞ টিম দ্বারা ঝটিকা সফর করে নির্মাণ-মান পরিদর্শন করা হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অফিসে বসেই ইমারত নির্মাণ মান তদারকি করা হয়। রাজউক হতে সাধারণত শিল্প ও বাণিজ্যিক ভবনের জন্য 'বিশেষ উন্নয়ন/ প্রকল্প ছাড়পত্র' এবং 'বসবাস ও ব্যবহার সনদ' প্রদানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সরেজমিন পরিদর্শন করা হয় না এবং গাফিলতি পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য, বাসা-বাড়ি ও বাণিজ্যিক ভবনে পোশাক কারখানা স্থাপন আইনত অবৈধ, অথচ ঢাকা শহরে অধিকাংশ পোশাক কারখানা এরকম আবাসিক বা বাণিজ্যিক ভবনে গড়ে উঠেছে। তথ্যদাতাদের মতে রাজউকের দুর্বল তদারকি, রাজউক পরিদর্শক ও পোশাক মালিকের দুর্নীতির মিথস্ক্রিয়ায় এ ধরনের স্থাপনায় কারখানা গড়ে উঠেছে, যা দীর্ঘ মেয়াদে ভবনের নিরাপত্তা ঝুঁকি সৃষ্টি করে। রানা প্লাজা, স্পেকট্রাম, ফিনিক্স ভবন ধসের ঘটনা রাজউকের দুর্বলতা ও দায়িত্বহীনতাকে প্রকাশ করে। বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউটের সভাপতির বক্তব্য অনুযায়ী, "একটি ভবন তৈরির সময় সেটি যথাযথভাবে নিয়ম মেনে হচ্ছে কিনা সেটি দেখা হয় না। বরং নির্মাণ শেষ হওয়ার পর সেটি অবৈধ চিহ্নিত হলে তা ভাঙতে নির্দেশ দেয়া হয়। অথচ অবৈধ ও মানহীন নির্মাণ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়ে বন্ধ করলে দুর্ঘটনার হাত হতে রক্ষা পাওয়া যেত। এসব দুর্ঘটনার জন্য ভবন মালিকেরা যেমন দায়ী, তেমনি সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও দায়ী"।[৬৬]

৩.৫ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা)

ব্যবসা পরিচালনার ট্রেড লাইসেন্স প্রদান, রাজউক ভুক্ত এলাকার বাহিরে কারখানা স্থাপনে ভূমি ব্যবহার অনুমোদন, কারখানা নির্মাণ, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের নকশা অনুমোদন ও নির্মাণ মান তদারকিকল্পে তৈরি পোশাক কারখানার সাথে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক রয়েছে। তৈরি পোশাক কারখানা স্থাপন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিম্নোক্ত সমস্যা ও অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়।

- **নির্মাণ নকশা অনুমোদনে রাজউক ও রাজউকভুক্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দ্বন্দ্ব:** স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহকে ভবন নির্মাণ অনুমোদনের ক্ষমতা প্রদানের কারণে রাজউকভুক্ত এলাকায় রাজউক ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভবন নির্মাণ অনুমোদনে দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়। যেমন- ভবন নির্মাণ আইন, ১৯৫২ (Building Construction Act, 1952), ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ণ, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৮ ও ড্যাপ অনুযায়ী রাজধানী ও আশপাশের অঞ্চলে ইমারত নির্মাণ, অনুমোদন ও তদারকির কর্তৃত্ব রাজউকের ওপর অর্পিত। আবার স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯-এর ধারা ৫০(গ) অনুসারে ইমারত নির্মাণ ও নকশা অনুমোদনের ক্ষমতা পৌরসভা কর্তৃপক্ষকে প্রদান করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯-এ ইউনিয়ন পরিষদকে ইমারত নির্মাণ ও নকশা অনুমোদনের ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে প্রদান না করা হলেও আইনের ধারা ১০৩ এর উপ-ধারা ১ এ বলা হয়েছে ইউনিয়ন এলাকায় 'কোন কাজ সম্পাদন করিবার' জন্য অনুমতি বা অনুমোদনের প্রয়োজন হলে পরিষদ লিখিতভাবে অনুমোদন প্রদান করিবে[৬৭]।'কোন কাজ সম্পাদন করিবার'- এ শব্দগুলোর কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা না থাকায় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণ এই ধারা বলে ইমারত নির্মাণের অনুমোদন প্রদান করে থাকেন। কিন্তু ড্যাপ অনুসারে রাজউকভুক্ত এলাকার সকল দায়িত্ব রাজউকের। রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পূর্বে রাজউকভুক্ত এলাকায় অবস্থিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের এ ক্ষমতা রহিত করে পৃথক কোন পরিপত্র সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয় নি[৬৮]। এ সুযোগে রাজউকভুক্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো ভবন নির্মাণের অনুমোদন প্রদান করে থাকে। বাস্তবে দেখা যায়, রাজউকভুক্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ) হতে অনুমতি নিয়ে তৈরি পোশাক কারখানা নির্মিত হচ্ছে। যেমন সাভারের রানা প্লাজা সাভার পৌরসভা থেকে এবং তাজরিন ফ্যাশন সাভারের ইয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদ হতে অনুমতি নিয়ে তৈরি হয়েছিল। এ দুটি এলাকা রাজউকভুক্ত, কিন্তু ভবন ও কারখানা মালিক কর্তৃপক্ষ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হতে অনুমোদন গ্রহণ করেছে বলে রাজউক থেকে অনুমোদন গ্রহণ করেনি। এছাড়া স্থানীয় সরকার পর্যায়ে (ইউনিয়ন) ভবন নির্মাণের অনুমতি প্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার (প্রকৌশলী) পদায়ন নেই, অথচ তারা ভবন নির্মাণের অনুমতি দিয়ে থাকে। যার ফলে স্থানীয় পর্যায়ে বিল্ডিং কোড না মেনে কারখানা নির্মিত হওয়ার কারণে দুর্ঘটনার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।

---

[৬৬] দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ২৫ এপ্রিল, ২০১৩।

[৬৭] স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ১০৩ এ বলা হয়েছে- "(১) এই আইন অথবা বিধি অথবা প্রবিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন কাজ সম্পাদন করিবার জন্য পরিসদের অনুমতি বা অনুমোদনের প্রয়োজন হইলে, উক্ত অনুমতি বা অনুমোদন লিখিত প্রদান করিতে হইবে।
(২) পরিষদ কর্তৃক অথবা পরিষদেও কর্তৃত্বের অধীন প্রদত্ত সকল লাইসেন্স অনুমোদন বা অনুমতি চেয়ারম্যান কর্তৃক অথবা চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে বিধি বা প্রবিধান দ্বারা পরিষদেও ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক সাক্ষরিত হইতে হইবে।"

[৬৮] রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে ইউনিয়ন পরিষদকে নির্মাণ অনুমোদন না প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে পরিপত্র জারি করা হয়। স্মারক নং-৪৬.০১৭.০১৮.০০.০০.০১০.২০১১(অংশ-১).২৪১, তারিখ ২৯ এপ্রিল, ২০১৩।

- **কারখানা স্থাপনে অনিয়ম:** প্রাপ্ত তথ্যমতে বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আওতাভুক্ত অঞ্চলে কারখানা স্থাপন ও নির্মাণ ছাড়পত্র প্রদানে চেয়ারম্যান/ মেয়রদের রাজনৈতিক, গোষ্ঠী ও ব্যক্তি স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার করে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে কালক্ষেপণ ও বিভিন্ন অজুহাতের মাধ্যমে কারখানা মালিকদের জিম্মি করার চেষ্টা করা হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে কারখানা নির্মাণে হয়রানি করা হয়। এসব থেকে রক্ষা পেতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারখানা মালিককে স্থানীয় চেয়ারম্যান, মেয়র বা রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাথে আর্থিক সমঝোতায় পৌঁছাতে হয়। সাভার অঞ্চলের একজন কারখানা মালিক বলেন, " 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট' পেতে ৩ লাখ টাকা দিতে হয়েছিল"।

৩.৬ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স পোশাক কারখানাগুলোতে অগ্নি নিরাপত্তা সনদ প্রদান ও নবায়ন, তদারকি, অগ্নি নিরাপত্তার বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান ও সচেতনামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পে নব্বই দশক হতে বিভিন্ন অগ্নি-দুর্ঘটনা পরিলক্ষিত হয়, বিশেষ করে তাজরিন ফ্যাশনের দুর্ঘটনা পরবর্তী অগ্নি নিরাপত্তা প্রশ্নে ফায়ার সার্ভিসের ভূমিকা আলোচিত হয়। এ সময় (তাজরিন দুর্ঘটনার পর) ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, সাভার ও আশুলিয়া অঞ্চলে ২৩.২৮% পোশাক কারখানায় অগ্নি-নির্বাপণ ব্যবস্থা খুবই নাজুক, ৩৭.৯৩% কারখানার মোটামুটি এবং ৩৮.৭৯% কারখানার অগ্নি-নির্বাপণ ব্যবস্থা ভাল।[৬৯]

৩.৬.১ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এ বিদ্যমান সমস্যা অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন:

নিচে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের তৈরি পোশাক কারখানায় অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির কিছু চিত্র তুলে ধরা হল।

- **বহুতল ভবন সংজ্ঞায় রাজউক এবং ফায়ার সার্ভিসের সমন্বয়হীনতা:** বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষ ফায়ার সার্ভিস রুলস এবং অগ্নি নির্বাপণ আইন, ২০০৩ অনুসারে কারখানার ওয়ার-হাউজ এবং ওয়ার্কশপ সনদ প্রদান করে থাকে। বহুতল ভবন (সাত তলার ঊর্ধ্বে) নির্মাণে ফায়ার সার্ভিস থেকে ভবনের অগ্নি নিরাপত্তার 'বিশেষ ছাড়পত্র' নিতে হয় এবং নিচু ভবন (সাত তলার নিচে) নির্মাণে 'সাধারণ ছাড়পত্র' নিতে হয়। অগ্নি-নির্বাপণ আইন, ২০০৩ (ধারা ৭) এ বহুতল ভবনের সংজ্ঞায় সাত তলা বা ২৪ মিটার বা তদূর্ধ্ব ভবনকে বোঝানো হয়েছে এবং ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ২০০৮ এ বহুতল ভবন বলতে দশ তলা বা ৩৩ মিটার বা তদূর্ধ্ব ভবনকে বোঝানো হয়েছে। বহুতল ভবনের অগ্নি-নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়, যা ব্যয়বহুল। আইনের সমন্বয়হীনতার সুযোগ নিয়ে কারখানা মালিক ৮ তলা বা ৯ তলা ভবনকে বহুতল ভবন নয় যুক্তি দেখিয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স হতে বিশেষ ছাড়পত্র গ্রহণ করে না। এ ধরনের ভবনের অগ্নি-নিরাপত্তা বিষয়ে রাজউক কোনো প্রকার চাপ প্রয়োগ করে না। এই সমন্বয়হীনতার কারণে বহুতল ভবনে যে ধরনের অগ্নি-নিরাপত্তা এবং নকশার প্রয়োজন তা মানা হয় না এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। একজন ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তা বলেন, "আমাদের যে মই বা লেডার আছে তা দিয়ে আমরা সর্বোচ্চ সাত তলা পর্যন্ত উঠতে পারি, কিন্তু যদি ভবন তার থেকে উঁচু হয় সে ক্ষেত্রে আলাদা নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু অনেক ভবন মালিক এই ব্যবস্থাকে অবহেলা করে।" এছাড়া কারখানা মালিকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভবন নির্মাণের পূর্বে 'ছাড়পত্র' নিলেও নির্মাণ পরবর্তী 'ফায়ার লাইসেন্স' নেন না।[৭০]

- **জনবল ঘাটতি:** ঢাকা বিভাগে ৭২টি এবং চট্টগ্রাম বিভাগে ৫৪টি ফায়ার স্টেশনসহ সমগ্র বাংলাদেশে ২৫৯টি[৭১] ফায়ার স্টেশন আছে যেখানে মোট ৬৫০০ জন[৭২] কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত। কিন্তু ঢাকা বিভাগে ফায়ার সার্ভিসের নিবন্ধনকৃত ৪,০০০ তৈরি পোশাক কারখানাসহ অন্যান্য শিল্প কারখানা, বাণিজ্যিক, আবাসিক ও সরকারি স্থাপনার অগ্নি নিরাপত্তা পরিদর্শনে মাত্র ১৫ জন পরিদর্শক নিয়োজিত। এত কম সংখ্যক পরিদর্শক দিয়ে সকল কারখানা পরিদর্শন সম্ভব হয় না।

- **অগ্নি নিরাপত্তা সনদ প্রদানে দুর্নীতি:** তৈরি পোশাক কারখানার কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে অগ্নি নিরাপত্তা সনদ বাধ্যতামূলক। বায়ার কমপ্লায়েন্স প্রশ্নে অগ্নি-নিরাপত্তা সনদকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বাসা-বাড়ি কিংবা বিল্ডিং কোড না মেনে তৈরি ভবনে স্থাপিত তৈরি পোশাক কারখানা অগ্নি-নিরাপত্তা সনদ প্রাপ্তির শর্তগুলো পূরণ করে না। পরিদর্শকরা আর্থিক সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে এ ধরনের ভবনে স্থাপিত কারখানার সনদ প্রদান করে থাকেন। ফায়ার সার্ভিসের নিজস্ব জরিপে যেসব কারখানার অগ্নি-নিরাপত্তা খুব নাজুক বলা হয়েছে, সেসব কারখানা কীভাবে ফায়ার সার্ভিস থেকে নিবন্ধিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে অগ্নি-নিরাপত্তা সনদ কীভাবে নবায়ন করে থাকে তা প্রশ্নবিদ্ধ। এছাড়া তথ্যদাতাদের মতে বিল্ডিং কোড না মেনে নির্মিত ভবনের

---

[৬৯] ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক ২০১২ সালের ডিসেম্বরে সাভার-আশুলিয়া এলাকার ২৩২টি পোশাক কারখানায় সরোজমিনে অগ্নিনির্বাপণ সম্পর্কিত ২৬টি শর্ত যাচাই করে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। বিস্তারিত দেখুন *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩ ডিসেম্বর, ২০১২।

[৭০] বহুতল বা বাণিজ্যিক ভবন নির্মান কালীন সময়ে 'ছাড়পত্র' গ্রহণ করতে হয় এবং ফায়ার সার্ভিস প্রদত্ত অগ্নি প্রতিরোধমূলক পরামর্শ মোতাবেক নির্মাণ সম্পন্নের পর 'ফায়ার লাইসেন্স' গ্রহনের বিধান রয়েছে।

[৭১] www.fireservice.gov.bd

[৭২] http://en.wikipedia.org, updated on on 24 April 2013 at 16:59.

ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে অগ্নি নিরাপত্তা সনদ পাওয়া যায়। ঢাকার একটি কারখানার প্রশাসনিক কর্মকর্তার ভাষ্য অনুযায়ী, "অতিরিক্ত ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকায় এবং ত্রুটিপূর্ণ ভবনের ক্ষেত্রে ৩ থেকে ৪ লাখ টাকা দিয়ে অগ্নি নিরাপত্তা সনদ পাওয়া যায়"।

- **ত্রুটিপূর্ণ পরিদর্শন:** কোনো কোনো ক্ষেত্রে টিনের ছাদ, বিকল্প সিঁড়ির অনুপস্থিতি, অপর্যাপ্ত নির্গমন দরজা, নির্গমন দরজা সঠিক স্থানে না থাকা, মেয়াদ উত্তীর্ণ অগ্নি-নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি ব্যবহার ইত্যাদি অনিয়ম পরিদর্শকরা অর্থের বিনিময়ে পরিদর্শনে ছাড় দিয়ে থাকেন। রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী মন্ত্রীসভা পর্যায় গঠিত তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, বেশিরভাগ কারখানায় ফায়ার ফাইটিং পাম্প বা জলাধার (৪৫ লিটার) নেই।[৭৩] আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তাদের পছন্দনীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হতে অগ্নি-নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হলে পরিদর্শনে ছাড় দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। ঢাকার যাত্রাবাড়িতে অবস্থিত একটি কারখানার ব্যবস্থাপক উল্লেখ করেন, "অগ্নি-নিরাপত্তা পরিদর্শকের পছন্দনীয় ব্র্যান্ড বা নির্দেশিত জায়গা থেকে সিলিন্ডার কিনলে সিলিন্ডারে গ্যাস না থাকলেও পরিদর্শনে সমস্যা হয় না"।

  এছাড়া, অগ্নি নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন টেকনিক্যাল ও কাঠামোগত বিষয়[৭৪] বাস্তবায়নে পরিদর্শকরা ব্যক্তিগত সুবিধার বিনিময়ে ছাড় দিয়ে থাকেন। অধিকাংশ তৈরি পোশাক কারখানা এ সকল টেকনিক্যাল বিষয় মেনে ভবন নির্মাণ করেন না এবং বহির্গমন সিঁড়িটি সরাসরি ভবনের বাইরের সাথে (Exit discharge) সংযুক্ত নয় এবং পর্যাপ্ত সিঁড়িও থাকে না। রানা প্লাজায় দেখা যায় প্রায় ৩৫০০ শ্রমিকের জন্য একটি মাত্র সিঁড়ি ছিল এবং সিঁড়ির Exit discharge ছিল ভবনের ভেতরে। তাজরিন ফ্যাশনে একের অধিক বিকল্প সিঁড়ি ছিল কিন্তু প্রতিটি সিঁড়ির Exit discharge ছিল নিচতলায় ভবনের ভেতরে। ফলে সকল শ্রমিককে চূড়ান্তভাবে একটি বহির্গমন পথ দিয়ে বের হয়ে আসতে হয়েছে।

এ ছাড়া, অগ্নি নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি ও রেসকিউ ভেহিকেল ক্রয়ে দুর্নীতি[৭৫], বিভিন পদে লোক নিয়োগে অনিয়ম[৭৬] এবং অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন পদে পদোন্নতি ও বদলি বিষয়ে অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, তাজরিন ফ্যাশনের দুর্ঘটনা পরবর্তী সম্প্রতিক কালে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সে বিদ্যমান এসব অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধে কিছু প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সূত্রে জানা যায়।

৩.৭ শ্রমিক সংগঠন (ট্রেড ইউনিয়ন)

শ্রমঘন তৈরি পোশাক শিল্পে শ্রমিক হচ্ছে উৎপাদনের মূল চালিকা শক্তি। মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক নিশ্চিতকরণ ও যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে শ্রমিকের অধিকার রক্ষায় শ্রমিক সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংগঠন করার অধিকার শ্রমিকের সর্বজনিন মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃত। শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, অধিকার বিষয়ে সচেতন করা, যৌথ দর-কষাকষি ও শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিত করা, শিল্পের উন্নয়নে মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক উৎসাহিত করা ইত্যাদি শ্রমিক সংগঠনের মূল দায়িত্ব। শক্তিশালী সংগঠন ও কার্যকর যৌথ দর-কষাকষি শ্রমিক-মালিকের আপোষ আলোচনায় সম-অধিকার নিশ্চিত করে, উভয় পক্ষের মধ্যে স্বচ্ছ সম্পর্ক নিশ্চিত হয়, ব্যয়বহুল শ্রম-দ্বন্দ্ব প্রতিকার পায় এবং সর্বোপরি এর ফলে শিল্পে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে (আইএলও, ২০০৫)। কর্ম-পরিবেশ ও শ্রমিক অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদণ্ড বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাংলাদেশ আইএলও'র মৌলিক আটটি কনভেনশনের মধ্যে সাতটি কনভেনশনে সম্মতি প্রদান করেছে।[৭৭] বাংলাদেশ কর্তৃক সম্মতি প্রদত্ত

---

[৭৩] রানা প্লাজা দূর্ঘটনা পরবর্তী মন্ত্রিসভা কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন, সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩।

[৭৪] ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ২০০৮ অনুসারে ইমারতে আগুণ লাগলে নিরাপদ নির্গমন পথের তিনটি অংশের কথা বলা হয়েছে- Exit access (exit এর মুখ পর্যন্ত রাস্তা); Exit (ঐ অংশটুকু যাহা আগুন লাগা হতে discharge পর্যন্ত নিরাপদ নির্গমন ঘটায়) এবং Exit discharge (Exit শেষ হওয়া হতে আশ্রয় পর্যন্ত)- এ তিনটি স্থান নিরাপদ দূরুত্ব ও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য অনুসারে নির্মাণের নিয়ম রয়েছে । আবার প্রতি ব্যক্তির জন্য ব্যবহারকারীর মাথাপিছু মেঝের পরিসর থাকবে (Floor area) ১০ বর্গ মিঃ (প্রায়) এবং একটি নির্গমন দরজা সর্বোচ্চ ৫০ জন ব্যবহার করবে। সিঁড়ির ক্ষেত্রে প্রতি ৫০০ লোকের জন্য ২টি Exit বহির্গমন থাকবে যার দূরত্ব হবে কর্মস্থল হতে ২৩ মিটার এবং একটি (১টি) বহির্গমন পথযুক্ত ইমারতে সর্বোচ্চ দুইটি তলা থাকবে।

[৭৫] স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক অগ্নিনির্বাপন সামগ্রী ক্রয়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের সত্যতা পায় এবং কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কর্তৃক অনুসন্ধানে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায়। বিস্তারিত দেখুন- *স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ৩ নং সাব কমিটির প্রতিবেদন*, ২০১০, নবম জাতীয় সংসদ; *দৈনিক সমকাল*, ২১ নভেম্বর, ২০১২ ও ১৮ এপ্রিল, ২০১৩।

[৭৬] ২০১১ সালে জনবল নিয়োগের অবৈধ অর্থ ও নিয়োগ পত্র পুলিশ কর্তৃক আটক করা হয় এবং পরবর্তীতে জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ও এসবি কর্তৃক তদন্তের নির্দেশ দেয়া হয় (সূত্র: স্মারক নং ৮৮৬, তারিখ ২৮/১১/২০১১, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)। তবে অধিদপ্তরের একটি সূত্র মতে এখনও তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়নি।

[৭৭] বাংলাদেশ কর্তৃক সম্মতি প্রদানকৃত ৭টি কনভেনশন হচ্ছে Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No.87); Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No.98); Forced Labour Convention, 1930 (No.29); Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105); Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No 182); Equal Remuneration Convention, 1951(No.100); Discrimination

কনভেনশনে (৮৭ ও ৯৮ নং) শ্রমিক সংগঠন করার এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে। উপরন্তু সংগঠন করার অধিকার মৌলিক রাজনৈতিক অধিকার হিসেবে খ্যাত এবং এ ক্ষেত্রে শ্রমিক সংগঠনগুলো দায়িত্বশীল ও গণতান্ত্রিক রাজনীতি নিশ্চিত করতে কার্যকর ভূমিকা রাখে (ডিএফআইডি, ২০০৪)। বাংলাদেশের সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে যৌথ দরকষাকষি নিশ্চিত কল্পে বাংলাদেশ শ্রম আইনে [অধ্যায় ১৩ ও ১৪, ধারা ১৭৮-২৩১] ট্রেড ইউনিয়ন, ফেডারেশন গঠন ও যৌথ দরকষাকষি ও মালিক-শ্রমিক শিল্প সম্পর্ক বিষয় বলা হয়েছে। আইনে ট্রেড ইউনিয়নকে যৌথ দরকষাকষির প্রতিনিধি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে (ধারা ২০২)। অবশ্য ধারা ২০৩ এ ফেডারেশন কোন কোন ক্ষেত্রে যৌথ দরকষাকষির প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে পারবে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[৭৮]

বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (ধারা ১৭৫-২৩১) অনুসারে শ্রম পরিদপ্তর শিল্প কারখানাগুলোতে শ্রম অধিকার ও যৌথ দরকষাকষি নিশ্চিতকল্পে সরকারি অংশীজন হিসেবে কাজ করে এবং ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন ও তদারকির ভূমিকা পালন করে। পরিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্যমতে তৈরি পোশাক খাতে বর্তমানে মোট অনুমোদিত ট্রেড ইউনিয়ন ১৫৭টি এবং ১২৩টি ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত ৩৪টি নিবন্ধিত ফেডারেশন রয়েছে।[৭৯] ট্রেড ইউনিয়ন এর সাথে জড়িত মোট সদস্য সংখ্যা ৫৬৩২৩ জন, যা এ খাতে কর্মরত শ্রমিকের ৩.৭৫%। তবে বাস্তবে মাত্র ৪০টি কারখানা ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন এবং ৯টি ফেডারেশন তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উল্লেখ্য, ২০১০ থেকে ২০১৩ সালে ২৯টি ট্রেড ইউনিয়ন অনুমোদন পায়। এছাড়া এ খাতে কিছু ফেডারেশন নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করে অবৈধভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, তৈরি পোশাক খাতে কারখানা পর্যায়ে কার্যকর ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা কম। কিন্তু যৌথ দর-কষাকষির পরিবেশ তৈরি করা এবং শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ট্রেড ইউনিয়নের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। একজন শ্রম পরিদর্শক বলেন, "ট্রেড ইউনিয়ন না থাকলে আমরা আপোষ মীমাংসায় ও শ্রম আন্দোলনে শক্ত ভূমিকা পালন করতে পারি না, কেননা উত্তেজিত শ্রমিকদের সঠিক প্লাটফর্ম থাকে না"।

তৈরি পোশাক খাতে কার্যকর সংগঠন প্রতিষ্ঠায় বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি বিশ্লেষণ করা হল।

৩.৭.১ কার্যকর শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠায় বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

- **ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধনে প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা:** ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগে। কিন্তু আইনানুযায়ী[৮০] আবেদন জমা দেওয়ার পর ৬০ দিনের মধ্যে প্রশাসনিক পরিদর্শনসহ[৮১] সকল প্রশাসনিক কাজ সম্পন্ন করার বিধান রয়েছে। তথ্যদাতাদের মতে সরকারের নেতিবাচক মনোভাব, মালিকের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাব এবং নিবন্ধন কর্মকর্তাদের যোগসাজশে সৃষ্ট ইচ্ছাকৃত প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা এবং আইনের জটিলতা ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে দীর্ঘসূত্রতার কারণ। ঢাকার শ্রম পরিদপ্তরের একজন পরিচালকের ভাষ্য মতে, "আগে যেসব শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নে জড়িত থাকতো তাদেরকে মালিক কারখানা হতে বের করে দিতো এবং নিবন্ধন পাওয়ার উপায়ও ছিল না, সরকারের একটা অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা ছিল। কেউ নিবন্ধন করতে আসলে আমরা নিরুৎসাহিত করতাম। এ ক্ষেত্রে শ্রম পরিদপ্তর যতটা না অফিসিয়াল তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক"।

(Employment and Occupation) Convention, 1958 (No 111) এবং বাংলাদেশ সম্মতি প্রদান করেনি Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) ।

[৭৮] শ্রম আইন এর ধারা ২০৩ এ বলা হয়েছে, "(১)এ অধ্যায়ে যা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন কোন প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান-পুঞ্জের যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি বলিয়া গন্য হইবে যদি উক্ত প্রতিষ্ঠানে উহার কোন সদস্য ট্রেড ইউনিয়ন উহার নির্বাহী কমিটির সভায় গৃহীত কোন প্রস্তাব দ্বারা ফেডারেশনকে উক্ত প্রতিষ্ঠান উহার পক্ষে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করিবার জন্য ক্ষমতা প্রদান করে: তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরুপ কোন ক্ষমতা প্রদান অনুমোদনযোগ্য হইবে না, যদি না ফেডারেশনের এবং সদস্য ট্রেড ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রে উক্তরুপ ক্ষমতা প্রদানের বিধান থাকে।"

(২) কোন ফেডারেশন কেবলমাত্র সেই প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান-পুঞ্জে যৌথ দরকষাকষির প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করিবে, যে প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান পুঞ্জে উহার কোন সদস্য ট্রেড ইউনিয়ন যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি হিসেবে আছে।

(৩) এই ধারার কোন কিছুই ধারা ২০০(৫)এর অধীনে গঠিত এবং রেজিষ্ট্রিকৃত কোন জাতীয় ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।"

[৭৯] শ্রম পরিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা হতে সংগৃহিত তথ্য, ৮ আগস্ট ২০১৩।

[৮০] শ্রম আইন এর ধারা ১৮২ (১) বলা হয়েছে "শ্রম পরিচালক, কোন ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক এই অধ্যায়ের সকল প্রয়োজনীয় বিষায়াদি পালিত হইয়াছে এই মর্মে সন্তুষ্ট হওয়ার পর, বিধি দ্বারা নির্ধারিত রেজিষ্ট্রারে উহাকে রেজিষ্ট্রি করিবেন এবং রেজিষ্ট্রিকরণের জন্য দরখাস্ত প্রাপ্তির ষাট (৬০) দিনের মধ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে একটি রেজিষ্ট্রিকরণ-প্রত্যায়নপত্র প্রদান করিবেন"।

[৮১] পূর্বে সরেজমিন পরিদর্শন পূর্বক ইউনিয়ন নিবন্ধনের বিধান ছিল না। ২০১৩ সালে সংশোধীত শ্রম আইনে ১৭৯ (২ক) উপধারা সন্নিবেশের মাধ্যমে সরেজমিন পরিদর্শন পূর্বক সঠিকতা যাচাইয়ের বিধান করা হয়েছে।

- **সরকারের নেতিবাচক মনোভাব:** আইএলও কনভেনশন ও বাংলাদেশ শ্রম আইনে শ্রমিক সংগঠন করার বিধান[৮২] থাকলেও সরকার বাংলাদেশে সরকারি শিল্প খাতে ট্রেড ইউনিয়নের নেতিবাচক প্রভাব দেখে তৈরি পোশাক খাতে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনকে অলিখিতভাবে নিরুৎসাহিত করে। এর সাথে তৈরি পোশাক মালিকদের ট্রেড ইউনিয়ন প্রশ্নে নেতিবাচক মানসিকতা রাজনৈতিকদের মনোভাবকে সুদৃঢ় করে। বাংলাদেশে বেশির ভাগ তৈরি পোশাক উদ্যোক্তা তীব্রভাবে ট্রেড ইউনিয়নের বিরোধিতা করে - তারা মনে করে ট্রেড ইউনিয়নের ফলে অল্প মজুরির বিষয়টি বিদেশি ক্রেতাদের আকৃষ্ট করে তা নষ্ট হয়ে যাবে (খান, ২০০১)। কিন্তু তাজরিন ফ্যাশনের দুর্ঘটনা পরবর্তী দেশি ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমালোচনা ও শ্রমিক সংগঠনের গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকারের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে নমনীয় মনোভাব লক্ষ করা যায়।

- **ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধনে আইনের জটিলতা ও প্রশাসনিক দুর্নীতি:** ২০১৩ সালে শ্রম আইন সংশোধনের পূর্ব পর্যন্ত ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের আবেদন প্রাপ্তির পর শ্রম পরিচালক কর্তৃক আবেদনের একটি কপি সংশ্লিষ্ট কারখানা মালিককে প্রদানের বিধান ছিল। এ নিয়মের কারণে শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের পূর্বেই অত্যাচারিত হতো[৮৩] (আইসিএফটিইউ, ২০০৬)। মালিক পক্ষ ইউনিয়ন নিবন্ধনের পূর্বেই জানতে পারতেন কোন কোন শ্রমিক আবেদনের সাথে সম্পৃক্ত। এ ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন প্রক্রিয়া হতে নিবৃত্ত করার জন্য মালিক কর্তৃক ইউনিয়ন গঠনের সাথে জড়িত শ্রমিকদেরকে বিভিন্ন ভাবে হয়রানি[৮৪], মিথ্যা অভিযোগে পুলিশ দিয়ে নির্যাতন (মোরশেদ, ২০০৭), খারাপ আচরণসহ চাকুরি হতে বরখাস্ত করে দেওয়া হতো। আইনি জটিলতা ও নির্যাতনের ভয়ে সাধারণ শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে নিরুৎসাহিত হতো। বর্তমান সংশোধনীর (২০১৩) মাধ্যমে আবেদনপত্রের কপি মালিককে প্রদানের বিধান রহিত করা হয়েছে। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে কারখানার মোট শ্রমিকের ৩০ শতাংশের সদস্য থাকার বিধান [ধারা ১৭৮(২)] বর্তমান প্রেক্ষাপটে তৈরি পোশাক কারখানার জন্য বাস্তবসম্মত নয়। কেননা, বর্তমানে কোনো কোনো কারখানায় ৫ থেকে ২০ হাজার শ্রমিক কর্মরত রয়েছে, আবার প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে শ্রমিকের সংখ্যা আরও বেশি হয়ে থাকে। এ বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের ৩০ শতাংশকে সদস্য করা দুরূহ ব্যাপার। আবার ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন প্রদানে শ্রম পরিচালক "সন্তুষ্ট" হলে নিবন্ধন প্রদানের বিধান (ধারা ১৮২) রয়েছে। কিন্তু "সন্তুষ্ট" শব্দের ব্যাখ্যার অভাবে শ্রম পরিচালক নিবন্ধন প্রদানে ক্ষমতার অপব্যবহার ও দীর্ঘসূত্রতার আশ্রয় নেয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। তথ্যদাতাদের মতে শ্রম পরিচালক বা এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার যোগসাজশে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন প্রক্রিয়াকে বন্ধ অথবা দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য মালিক পক্ষ ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিয়ে থাকে। আবার অনেক সময় মালিকপক্ষ ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রভাবশালীদের বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে থাকে। তথ্যদাতা একজন শ্রমিক নেতা বলেন, "সম্প্রতি একটি কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের সকল কাগজ সঠিক থাকা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিচ্ছিল না, কারণ হলো সচিব এর নিষেধ ছিল; কিন্তু কর্তৃপক্ষ জমাদানকৃত সকল কাগজের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে প্রাপ্তি স্বীকার পত্র প্রদান করেছে"। উল্লেখ্য, সাধারণত ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের কাছ থেকে ২ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকা আদায় করার অভিযোগ রয়েছে।

- **রাজনৈতিক বিবেচনায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, নিবন্ধন ও কার্যক্রম:** ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে রাজনৈতিক সুপারিশ গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল বা আদর্শ বিবেচিত হয়ে থাকে। সরকারপক্ষীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলো তুলনামূলকভাবে কম সময়ে নিবন্ধন লাভ করলেও অন্যান্যদের ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়া হয় দীর্ঘতর। একজন শ্রমিক নেতা বলেন, "বিগত বছরের (২০১০-২০১৩) যে ২৯টি ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন হয়েছে এর মধ্যে যেগুলো শ্রমিক লীগের সেগুলো নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে মাত্র ১১-১৫ দিন লেগেছে।" এ ধরনের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে শ্রমিক স্বার্থ ও অধিকারের পরিবর্তে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মুখ্য ভূমিকা পালন করে। দুর্বল সাংগঠনিক কাঠামোর কারণে শিল্প প্রতিষ্ঠানে যৌথ দরকষাকষি কার্যক্রমের পরিচালনা ট্রেড ইউনিয়নগুলো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে না, শুধুমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনে স্বল্প সময়ের জন্য এগুলোর সক্রিয় ও মারমুখী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় (হক, ২০০৪)। অপরদিকে ইউনিয়নগুলোর সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে অথবা রাজনৈতিক নেতা দ্বারা পরিচালিত হয় এবং রাজনৈতিক দলের একটি অঙ্গ হিসেবে তারা কারখানায় কাজ করে (তামান্না, ২০১০)। বেশিরভাগ ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব রাজনৈতিক দলের সংশ্লিষ্টতার মাধ্যমে তাদের নেতৃত্ব চিরস্থায়ী করতে

---

[৮২] বিস্তারিত দেখুন- বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩ [অধ্যায় ১৩ ও ১৪, ধারা ১৭৮-২৩১] এবং আইএলও কনভেনশন- Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No.87); Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No.98).

[৮৩] International Confederation of Free Trade Union (ICFTU, 2006) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সাধারণ সভায় প্রশ্ন উত্থাপন করে, "মালিকদের সংগঠন থাকলে শ্রমিকদের সংগঠন কেন থাকবে না?"

[৮৪] মালিক কর্তৃক ট্রেড ইউনিয়ন আবেদনকারীর বিরুদ্ধে যে সব হয়রানি করা হতো, তা হচ্ছে- চাকুরি থেকে বহিষ্কার করা; মিথ্যা মামলা দেওয়া; কাজের টার্গেট বাড়িয়ে দেওয়া; মানসিক নির্যাতন করা; কারো সাথে কথা বলতে না দেওয়া অথবা বাথরুমে যেতে হলে অনুমতি নেওয়ার বাধ্যবাধকতা; স্থানীয় মাস্তান দ্বারা মারধোর করা; সুযোগ সুবিধা বৈষম্য করা যেমন ইনক্রিমেন্ট না দেওয়া; ছুটি না দেওয়া; সাদা কাগজে পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর নেওয়া; মূল-নেতাকে খারাপ আচরণ এবং অনৈতিক কাজের দোষে সাব্যস্ত করে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা; মূল নেতাকে ঘুষ প্রদান করে ট্রেড ইউনিয়ন না করার জন্য উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি।

চায়। এ ক্ষেত্রে প্রায় সব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সাথে যুক্ত থাকে এবং অধিকাংশ ফেডারেশন রাজনৈতিক দলের সাথে সংযুক্ত থাকে। বিশেষত যখন দল ক্ষমতায় থাকে তখন ফেডারেশন তাদের সদস্য ট্রেড ইউনিয়নের সমর্থনের ব্যাপারে তেমন আগ্রহ দেখায় না এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতারাও ইউনিয়নের সদস্যদের (শ্রমিকদের) স্বার্থের প্রতি নজর রাখেন না (মণ্ডল, ২০০২; তাহের, ১৯৯৯)। আবার অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতায় কর্মীদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার হয়, এ ক্ষেত্রে মালিকদের অভিযোগ হলো শ্রমিকদের বিভিন্ন রাজনৈতিক মিটিং মিছিলে নিয়ে যাওয়া হয় যা উৎপাদন এর ভয়ংকর ক্ষতি সাধন করে। বিপরীত দিকে যে সকল রাজনৈতিক দল ক্ষমতার বাইরে থাকে তাদের সম্পৃক্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলো বিভিন্নভাবে শ্রমিক অসন্তোষ তৈরির ঝুঁকি সৃষ্টি করে (হাই, ১৯৯২)।

- **ফেডারেশনের কার্যাবলী সম্পর্কে বিধিমালার অনুপস্থিতি:** বাংলাদেশ শ্রম আইনে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও পরিচালনা সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা ও বিধি বিধান থাকলেও ফেডারেশনের গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে কোন বিধিমালা নেই। বিধিমালা না থাকার কারণে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যাবলীতে ফেডারেশন অযাচিত হস্তক্ষেপ করে এবং কারখানা পর্যায়ের ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বকে অবদমিত করে রাখার চেষ্টা করা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে ফেডারেশন পরিচালনার কোন নিয়মনীতি না থাকার কারণে জাতীয় ও কারখানা পর্যায়ে শ্রমিক অধিকার সংক্রান্ত সমঝোতা, আপোষ আলোচনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। অথচ এ সকল নেতৃবৃন্দ কারখানা পর্যায়ের সমস্যা যেমন জানেন না তেমনি কারখানা পর্যায়ের ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব করেন না। ফলে প্রকৃত অর্থে যৌথ কষাকষির আলোচনায় সংক্ষুব্ধ কারখানার ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির অংশগ্রহণ থাকে না। যে কারণে অনেক ক্ষেত্রে গৃহীত সিদ্ধান্ত শ্রমিক-বান্ধব হয় না।

- **ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত না হওয়া:** তৈরি পোশাক খাতে জাতীয় পর্যায়ের ফেডারেশন হতে শুরু করে কারখানা পর্যায়ের ট্রেড ইউনিয়নগুলোর নেতৃত্ব গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয় না। জাতীয় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ফেডারেশনগুলোর নেতৃত্ব রাজনৈতিক দলীয় প্রধান দ্বারা মনোনয়ন করা হয়। ফলে অনেক সময় প্রকৃত শ্রমিক নেতৃত্বে আসতে পারে না। কারখানা-ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের খুব নগণ্য সংখ্যক নেতাকে ফেডারেশন নেতৃত্বে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, ফলে কারখানা পর্যায়ে নেতৃত্ব সৃষ্টি হয় না। আবার এ খাতে সক্রিয় যে ৪০-৫০টি ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে সেগুলোর নেতৃত্ব সুনির্দিষ্ট ৪০-৫০ জন ব্যক্তির নিকট কুক্ষিগত। এ সকল নেতৃত্ব ইউনিয়নকে শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যবহার না করে ব্যক্তিগত খ্যাতি, রাজনৈতিক-সামাজিক প্রতিপত্তি ও আয়ের উৎস হিসেবে ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে।

- **অর্থের বিনিময়ে মালিকের স্বার্থে ব্যবহার:** কোনো কোনো ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশন নেতা অর্থের বিনেময়ে মালিকের স্বার্থে কাজ করে থাকে। ফলে কারখানা ও জাতীয় পর্যায়ে শ্রমিক অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষিত হয় না। গবেষণায় দেখা যায় জাতীয় পর্যায়ে শ্রমিক নেতাদের একটি অংশ মালিক সংগঠন বিজিএমইর বর্ধিত অংশ হিসেবে মালিক স্বার্থে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। জাতীয় পর্যায়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে যে ফেডারেশনগুলো কাজ করে তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মালিক পক্ষের নিজস্ব নেতা হিসেবে বিবেচিত, এ সকল ফেডারেশন নেতৃত্ব শ্রমিক অধিকারের পরিবর্তে আঁতাতের মাধ্যমে মালিক পক্ষের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে। অপরদিকে ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে এমন কারখানায় নেতৃস্থানীয় শ্রমিক নেতারা চাঁদাবাজে (Extortionists) পরিণত হয় এবং দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পড়ে (লিবকম, ২০০৬)। একদিকে তারা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমিক সম্পৃক্ততা নিশ্চিত কল্পে মালিকপক্ষের নিকট হতে অর্থ আদায় করে, অন্যদিকে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য শ্রমিকদের নিকট থেকেও চাঁদা আদায় করে।

আবার, বিজিএমই কর্তৃক বিভিন্ন বিরোধ নিস্পত্তির আপোষ মীমাংসায় কোনো কোনো ট্রেড ইউনিয়ন নেতা অর্থের বিনিময়ে মালিকের স্বার্থে কাজ করে । বিজিএমইএ'র একটি বিরোধ নিস্পত্তি প্রক্রিয়া অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণে[৮৫] দেখা যায় সংশ্লিষ্ট কারখানার মালিককে নিস্পত্তিতে জড়িত শ্রমিক নেতা, বিজিএমইএ কর্মকর্তা ও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে টাকা দিতে হয়েছে। এছাড়া ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, দুর্ঘটনাজনিত বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণ আদায় ও শ্রম অধিকার বিষয়ে কোনো কোনো শ্রমিক নেতা অর্থের বিনিময়ে মালিক পক্ষের স্বার্থে কাজ করে। এ ধরনের নেতাদেরকে বিজিএমইএ'র 'পকেট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা' বলে আখ্যায়িত করা হয়। বেশির ভাগ তথ্যদাতা তাজরিন ও রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকদের তালিকা তৈরি ও ক্ষতিপূরণ বণ্টনে অনিয়মের অভিযোগ করেন। ঢাকার আশুলিয়ার একজন শ্রমিক নেতার ভাষ্য মতে, "২০০৬ সালে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে দর-কষাকষির ক্ষেত্রে বিজিএমইএ কর্তৃপক্ষ কোনো কোনো পছন্দনীয় শ্রমিক নেতাকে ২ থেকে ৫ লাখ টাকার বিনিময়ে ন্যূনতম মজুরির দাবি থেকে সরে যেতে চাপ প্রয়োগ করে"।

[৮৫] গবেষণাকালীন সময়ে ঢাকার তেজগাঁও শিল্প এলাকার একটি পোশাক কারখানার মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব নিরসন কল্পে অনুষ্ঠিত বিরোধ নিস্পত্তি সভা গবেষক কর্তৃক পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং বিভিন্ন পক্ষের মতামত গ্রহণ করা হয়।

- **ট্রেড ইউনিয়নে নারী শ্রমিকের কম অংশগ্রহণ:** তৈরি পোশাক খাতে বিদ্যমান ট্রেড ইউনিয়নে নারী সদস্যের অংশগ্রহণ নেই বলা চলে। আইন অনুযায়ী মোট শ্রমিকের ২০ শতাংশ নারী শ্রমিক থাকলে ট্রেড ইউনিয়নের নির্বাহী কমিটিতে ১০ শতাংশ নারী সদস্য থাকার বিধান রয়েছে।[৮৬] বাস্তবে দেখা যায়, পোশাক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ৮৫% নারী হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ ইউনিয়নে এ বিধান পালন করা হয় না। বরং অল্প সংখ্যক (১৫ শতাংশ) পুরুষ সদস্যই বৃহৎ নারী সদস্যদেরকে অবদমিত করে রাখে। কার্যত, ট্রেড ইউনিয়নের সাথে নারী শ্রমিকের সংশ্লিষ্টতাকে অগ্রাহ্য করা হয় (মোরশেদ, ২০০৭)। মালিকেরা তরুণ নারী শ্রমিক নিয়োগ দেওয়ার ক্ষেত্রে বেশি আগ্রহ প্রকাশ করে, কেননা তাদেরকে অল্প বেতনে বা অনেক সময় ন্যূনতম বেতনে ও নিম্ন কর্ম-পরিবেশে সহজে কাজ করানো যায় এবং এসব নারী শ্রমিক ইউনিয়নে যোগদানে নিরুৎসাহিত হয় (হক, ২০০১) অথবা ইউনিয়নে যোগ দেওয়ার প্রবণতা কম থাকে (ম্যাককোনেল, কম্পবেল ও স্টেনলি, ২০০০)। মূলত গ্রামীণ পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থা থেকে আগত একজন নারী শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে কোনো ধারণা থাকে না। অপরদিকে ট্রেড ইউনিয়নের পুরুষ নেতৃত্ব নারীদের সমান গ্রহণযোগ্যতাও প্রদান করে না। এখানে জেন্ডার ধারণা কাজ করে, যার কারণে নারীদের প্রয়োজনীয়তা ও প্রাধান্য অগ্রাহ্য করা হয়। ফলে ট্রেড ইউনিয়নগুলোতে নেতৃত্ব গঠনে সমাজের সামগ্রিক চিত্রের মতো পুরুষতান্ত্রিক আচরণ প্রতীয়মান হয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারী-কেন্দ্রিক বিষয়গুলো (রাস্তায় অথবা কারখানায় মহিলাদের নিগ্রহ, প্রয়োজনীয় বাথরুমের সুবিধা, মাতৃত্বকালীন ছুটি, নারী স্বাস্থ্য ইত্যাদি) এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা থাকে (আবসার, ২০০১)।

- **ট্রেড ইউনিয়নের সাথে জড়িত কর্মীদের যৌথ দর-কষাকষির দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অভাব:** যৌথ দরকষাকষির অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা না থাকায় শ্রমিক শিক্ষিত দক্ষ মালিকদের কাছ থেকে নিজেদের অধিকার আদায় করতে পারে না। ট্রেড ইউনিয়নের কার্যবিধি বা কী উদ্দেশ্যে ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালিত হবে তার সঠিক ব্যাখ্যা একদিকে যেমন বাংলাদেশে শ্রম-আইনে সুনির্দিষ্ট করা হয় নি তেমনি কর্মীদের ধারণার অভাব বিদ্যমান। এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকদের কার্যকর কোনো প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় না। শ্রমিকের অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা, ট্রেড ইউনিয়নগুলোর গুটিকয়েক নেতৃত্ব, শ্রমিকের সামগ্রিক অসচেতনতা, শিক্ষার অভাব, মালিক কর্তৃক বিভিন্ন নৈর্ব্যক্তিক আচরণের ভয় এবং অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের কারণে শ্রমিকের যৌথ দর-কষাকষির দক্ষতা অর্জিত হয় না। ভুক্তভোগী শ্রমিক কর্তৃক শ্রমিক অধিকার কিংবা বঞ্চনার ঘটনাগুলো এককভাবে মোকাবেলা করার কারণে ছড়ানো ছিটানো এ সকল ভুক্তভোগীদের অভিযোগ সবার আগ্রহ তৈরি করতে পারে না অথবা সমন্বিতভাবে যৌথ দর-কষাকষির আন্দোলন উৎসাহিত হয় না (কবির, ২০০৪)। অপরদিকে এ খাতে কোনো কোনো ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের জাতীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি ও দুর্নীতির চর্চা ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সক্ষমতা হারানো ও দুর্বলতার জন্য দায়ী (মাহমুদ, ২০০৯)।

- **নিবন্ধনবিহীন ফেডারেশনের নেতৃত্বে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক স্বার্থে কার্যক্রম:** অনেক ফেডারেশন নিবন্ধন না থাকা সত্ত্বেও একক ব্যক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সহযোগিতায় কাজ করে থাকে। শ্রমিক নামধারী এ সকল ফেডারেশন নেতৃত্ব শ্রমিক অধিকার সম্পর্কে কার্যক্রম পরিচালনা না করে বরং মধ্যসত্ত্বভোগী হিসেবে আর্থিক ও ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনে সচেষ্ট থাকে। শ্রমিক আন্দোলনে ইন্ধন যোগানো ও মালিকদের নিকট হতে সুবিধা গ্রহণসহ শ্রমিক আন্দোলনকে রাজনীতিকীকরণে সচেষ্ট থাকে।

- **প্রাপ্ত অনুদান আয়ের উৎস হিসেবে ব্যবহার:** অনেক ক্ষেত্রে আইএনজিও হতে প্রাপ্ত অনুদান ফেডারেশন নেতৃত্বে আয়ের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা বা আইএনজিও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সচেতনতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের জন্য ফেডারেশনগুলোকে আর্থিক এবং উপকরণাদি সহযোগিতা করে। কিন্তু এ ধরনের সহযোগিতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জড়িত ফেডারেশনগুলোর সামর্থ্যের অভাব এবং দুর্নীতির মানসিকতার কারণে ফলপ্রসূ হয় না। ফেডারেশন নেতৃত্বের মূল লক্ষ্য থাকে আকর্ষণীয় কর্মসূচি বা প্রকল্প থেকে আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা (লিবকম, ২০০৬)। তথ্যদাতাদের মতে, অনেক ফেডারেশন বিশেষ করে শ্রমিকদেরকে প্রশিক্ষণ না দিয়ে প্রশিক্ষণের টাকা আত্মসাত করে। অপরদিকে অনেক ফেডারেশন তাদের আঙ্গিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এনজিও পরিচালনা করে যা প্রচলিত ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রমের বাইরে ব্যাপক ভিত্তিক কার্যক্রমের মাধ্যমে নতুন এক ধরনের প্রতিষ্ঠানের রূপ নিচ্ছে (কবির, ২০০৪)। বিশেষজ্ঞদের তথ্যদাতাদের মতে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান শ্রমিক সংগঠনের মূল চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক।

৩.৮ বায়ার

তৈরি পোশাক শিল্পে বায়ার বলতে সকল বিদেশি ক্রেতা প্রতিষ্ঠানকে বোঝানো হয়, চূড়ান্ত ভোক্তাকে বোঝানো হয় না। পণ্যের গুণগত মান, কারখানার সঠিক কর্ম-পরিবেশ ও শ্রম অধিকার নিশ্চিত করে কারখানায় উৎপাদন আদেশ প্রদানে বায়ারের আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তৈরি পোশাক ব্যবসায় বায়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন। পণ্য উৎপাদনের আদেশ প্রাপ্তি,

[৮৬] *বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৩*, ধারা ১৭৬(ঙ)।

ব্যবসায় টিকে থাকা ও কারখানার উন্নয়ন অনেকাংশে বায়ারের ওপর নির্ভরশীল। ঢাকার একজন মার্চেন্ডাইজারের ভাষ্য মতে, "বায়ার একটা ফ্যাক্টর, বায়ার হলো এই ট্রেড এর সর্বেসর্বা"।

বাংলাদেশে তৈরি পোশাক কারখানার সাথে সাধারণত দু'ধরনের বায়ারের যোগাযোগ হয়ে থাকে। প্রথমত, নিজস্ব শোরুম ও নিজস্ব ব্রান্ড এর মাধ্যমে পণ্য বাজারজাতকারী বায়ার। বাংলাদেশে এ ধরনের প্রায় ৮৫টি কোম্পানি তাদের ব্যবসা পরিচালনা করছে[৮৭], এদের মাঝে কারো কারো বাংলাদেশে আঞ্চলিক অফিস রয়েছে। এ ধরনের বায়ার তিন ভাবে পণ্য ক্রয় করে থাকে- (ক) বাংলাদেশে অবস্থিত নিজস্ব অফিসের মাধ্যমে; (খ) সোরসিং অফিস বা ইন্টারন্যাশনাল কোন বায়ার এজেন্সির (যেমন লিংফু, ইত্যাদি) মাধ্যমে; এবং (গ) লোকাল বায়িং হাউজ/ বায়ার অফিসের মাধ্যমে (মাঝে মাঝে করে থাকে)। দ্বিতীয় ধরনের বায়ার হচ্ছে, যে সকল বায়ারদের নিজস্ব ব্রান্ড ও শোরুম নেই, এ ধরনের বায়ার সাধারণত লোকাল বায়িং হাউজ এর মাধ্যমে পণ্য ক্রয় করে। এ ক্ষেত্রে বায়িং হাউজ গুলো থার্ড পার্টি হিসেবে কাজ করে। লোকাল এ বায়ার/অফিসগুলোকে 'ডমেস্টিক বায়ার' বলা হয়। মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ডমেস্টিক বায়ারদের ক্ষেত্রে অনিয়ম বেশি ঘটে। শ্রম অধিকার ও কর্ম পরিবেশের মানের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে কম মূল্যে ভাল পণ্যের ওপর বায়ারের আগ্রহ বেশি থাকে। বায়ারের বিভিন্ন কার্যক্রম তদারকির জন্য আর্ন্তজাতিক কিছু মানদন্ড থাকলেও বাংলাদেশের আইনে এ সংক্রান্ত কোন বিধি বিধান নেই। যে সকল বায়ার প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে নিজস্ব অফিস স্থাপন ও ব্যবসা পরিচালনা করতে চায় তাদেরকে বিজিএমইএ'তে তালিকা ভুক্ত হতে হয়, তবে তা বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু বিজিএমইএ কোনো নিয়ন্ত্রকমূলক কর্তৃপক্ষ না হওয়ার কারণে এবং বায়ারের সাথে সরাসরি বিজিএমইএ'র সদস্যদের ব্যবসায়িক স্বার্থ থাকার কারণে বায়ারের কার্যক্রম তদারকির করার বিষয়টি উপেক্ষিত হয়। তৈরি পোশাক খাতের একটি আন্তর্জাতিক অডিট কোম্পানির ঢাকাস্থ এক কর্মকর্তা বলেন, "বেশির ভাগ বায়ারদের কম মূল্যে পণ্য ক্রয়ের প্রতিযোগিতা এবং ডমেস্টিক বায়িং হাউজগুলোর মধ্যস্বত্ব ঠিক রাখার চেষ্টার কারণে বায়িং হাউজগুলো কমপ্লায়েন্স অবস্থা অত্যন্ত খারাপ এমন কারখানাগুলোতে তাদের পোশাকের অর্ডার দিতে দ্বিধা করে না। এখানে শ্রমিকের অধিকার, নিরাপদ কর্ম-পরিবেশ মানের চেয়ে কম মূল্যে গুণগত পণ্যের ওপর অধিক আগ্রহ সৃষ্টি হয়"। এ কারণে মালিক 'কমপ্লায়েন্ট কারখানা' দেখিয়ে রপ্তানির চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে কিন্তু পোশাকটি নন-কমপ্লায়েন্ট কারখানায় উৎপাদন করা হয়।

৩.৮.১ বায়ার অনুসৃত অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন:

- **নন-কমপ্লায়েন্ট কারখানায় উৎপাদন:** অনেক ক্ষেত্রে মালিক 'কমপ্লায়েন্ট কারখানা' দেখিয়ে রপ্তানির চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে নন-কমপ্লায়েন্ট কারখানায় পণ্য উৎপাদন করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে নিজস্ব ব্রান্ড ও আঞ্চলিক অফিস রয়েছে এমন বায়ার নিজের ব্রান্ড বা কোম্পানির সুনাম রক্ষা করার লক্ষ্যে দেশের বৃহৎ কোম্পানিগুলোর সাথে ব্যবসা পরিচালনায় আগ্রহী থাকে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের কোম্পানিগুলোর সব কারখানায় কমপ্লায়েন্স বজায় থাকে না। ফলে মালিক ও বায়ারের সমঝোতায় এক ধরনের অনিয়ম সৃষ্টি হয় এবং নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করা হয়:
  - কোনো কোনো ক্ষেত্রে বায়ার প্রতিনিধির যোগসাজশে মালিকপক্ষ 'কমপ্লায়েন্ট কারখানা'[৮৮] দেখিয়ে রপ্তানি অর্ডার সংগ্রহ করে, কিন্তু বায়ার প্রতিনিধির জ্ঞাতসারে নন-কমপ্লায়েন্ট কারখানায় পণ্য উৎপাদন করে।
  - পশ্চিমা বড় বড় বায়ার স্বল্প সময়ে বিপুল পরিমাণ কাজের অর্ডার প্রদান করে। ফলে বায়ারের চাপ সামলাতেই অনুমোদনবিহীন ছোট কারখানায় সাব-কন্ট্রাক্ট দিতে হয়। উদ্যোক্তারা এ বিষয়টি স্বীকার করেন, পশ্চিমা বিক্রেতারাও দীর্ঘদিন ধরেই এই সাব-কন্ট্রাক্টের বিষয়টি দেখেও না দেখার ভান করে আসছে।[৮৯]
  - বায়ার কর্তৃক নির্দিষ্ট মূল্যে প্রতিশ্রুত কমপ্লায়েন্ট কারখানায় অর্ডার না দিয়ে কমিশন বা অবৈধ অর্থের বিনিময়ে কম মূল্যে নন-কমপ্লায়েন্ট কারখানায় অর্ডার দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে কমিশন বা অবৈধ অর্থ নগদে মালিক বায়ার প্রতিনিধিকে পরিশোধ করে থাকে।
  - অপরদিকে বায়ারদের মধ্যে পণ্যের গুণগত মান অডিট করার প্রতি আগ্রহ বেশি থাকে, এ ক্ষেত্রে অনেক বায়ার কমপ্লায়েন্স মান নিরীক্ষা না করে শুধুমাত্র পণ্যের মান নিরীক্ষা করে থাকে।

- **কৃত্রিম কমপ্লায়েন্ট পরিবেশ সৃষ্টি:** তৈরি পোশাক খাতে কমপ্লায়েন্স অডিট প্রতিষ্ঠানের[৯০] রিপোর্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় কোনো কোনো নন-কমপ্লায়েন্স কারখানায় বায়ার প্রতিনিধির জ্ঞাতসারে কমপ্লায়েন্স অডিটরদের সন্তুষ্টির জন্য মালিক

[৮৭] www.textilefashionstudy.com

[৮৮] তৈরী পোশাক শিল্পে কমপ্লয়েন্স বলতে সাধারণ ভাবে বুঝানো হয় কিছু বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখা, যেমন-মান সম্পন্ন কারখানা স্থাপনা, কর্ম পরিবেশ, শ্রমিক অধিকার, শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তামূলক উদ্যোগ এবং পরিবেশগত নিরাপত্তা, ইত্যাদি।

[৮৯] *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ঢাকা, ১৬ ই সেপ্টেম্বর, ২০১৩

[৯০] আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গ্লোবাল ভ্যালু চেইন নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিক ভাবে কিছু মানদণ্ড নির্ণয় করা হয়। এ সব মানদণ্ড সরবরাহ প্রক্রিয়ার (Supply chain) বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা নিরীক্ষার জন্য বিভিন্ন নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান কাজ করে থাকে। কারখানা পর্যায়ে স্যোসাল কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষার জন্য আর্ন্তজাতিক কিছু নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান (যেমন- এসআরজিএস) কাজ করে। ক্রেতা/বায়ার পণ্য ক্রয় করার পূর্বে এসব নিরীক্ষা

কর্তৃক কৃত্রিম কমপ্লায়েন্ট পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। বায়ার প্রতিনিধি এবং কারখানা মালিকের যোগসাজশে নিরীক্ষার দিন পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করা হয় (আন্তর্জাতিক সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষায় নিয়মানুসারে নিরীক্ষার দিন পূর্বে জানানোর বিধান নেই) এবং ঐ দিন কারখানা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হয়, চলাচলের রাস্তায় ও সিঁড়িতে কাঁচামাল রাখা হয় না, পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ খাবার পানি, লাইট ইত্যাদির সাময়িক ব্যবস্থা করা হয়। মালিকের আজ্ঞাভাজন শ্রমিক কর্তৃক অথবা সাধারণ শ্রমিকদেরকে চাকুরিচ্যুত করার ভয় দেখিয়ে তাদের সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স-এর ঘাটতি অডিটরের কাছে স্বীকার করানো হয় না। এছাড়া কারখানায় শিশু শ্রমিক থাকলে তাদেরকে পরিদর্শনের সময় সরিয়ে দেওয়া হয়।

- **নিরীক্ষা প্রতিবেদনে কারখানার প্রকৃত চিত্র গোপন করা:** আন্তর্জাতিক আইন ও আমদানিকারক দেশের শর্তাবলি পূরণের নিমিত্তে বায়ার ও উৎপাদক প্রতিষ্ঠানকে (কারখানা মালিক) বিভিন্ন সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত এবং স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, পরিবেশ, পণ্যের গুণগত মান ইত্যাদি সংক্রান্ত সনদ পণ্য সরবরাহের সাথে সরকারি কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হয়। এ ক্ষেত্রে অনেক সময় শর্তাবলি পূরণের নিমিত্তে বায়ার প্রতিনিধি, কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষক ও মালিকের যোগসাজশে নিরীক্ষা প্রতিবেদনে কারখানার প্রকৃত চিত্র গোপন করা হয়।

- **একই কারখানায় ভিন্ন ভিন্ন কোড অব কন্ডাক্ট অনুসরণ:** বায়ার পোশাক শিল্প কারখানাতে রপ্তানি আদেশ (Export Order) দেয়ার সময় কারখানার সার্বিক অবস্থা মূল্যায়ন করে এবং কারখানাতে শ্রম-আইন প্রতিপালনে ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সাধারণত এরূপ কারখানাতে কোন রপ্তানি আদেশ প্রদান করে না। কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত কল্পে কারখানাতে বায়ার ভিন্ন ভিন্ন Code of Conduct মেনে চলার শর্ত আরোপ করে। কিন্তু এক ক্রেতার সাথে অন্য ক্রেতার Code of Conduct এক রকম হয় না। ফলে একই কারখানায় ভিন্ন ভিন্ন বায়ারের কাজ করতে গিয়ে Code of Conduct বাস্তবায়ন করা মালিকের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না, বরং বিশৃঙ্খলার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। এখানে উল্লেখ্য, একটি নির্দিষ্ট মানের ওপর নির্ভর করে কারখানার গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করতে পারে এরকম কোনো সরকার স্বীকৃত সমন্বিত কোড অফ কন্ডাক্ট নেই। অপরদিকে বায়ার কর্তৃক কারখানার কাঠামোগত নিরীক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বায়ার এ সম্পর্কে আগ্রহও প্রকাশ করে না।

- **পণ্য-মূল্যের সাথে অবৈধভাবে অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন:** কোনো কোনো ক্ষেত্রে বায়ার বা বায়ার প্রতিনিধি পণ্যের আদেশ প্রদানের সময় পণ্যমূল্যের সাথে অবৈধভাবে অতিরিক্ত মূল্য ধার্য করে এবং তা নগদে মালিকপক্ষের কাছ থেকে সংগ্রহ করে। অপরদিকে উৎপাদনকালীন সময়ে বায়ার প্রতিনিধি (কমপ্লায়েন্স ও মান নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা) মালিক পক্ষের নিকট হতে আদেশ বাতিলের ভীতি প্রদর্শন করে আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করে।

- **অর্থ পরিশোধে গড়িমসি:** কোনো কোনো ক্ষেত্রে বায়ার বিভিন্ন অজুহাতে অর্থ পরিশোধে গড়িমসি করে অথবা ঠিকমতো পরিশোধ করে না।

৩.৯ কারখানা প্রতিষ্ঠায় নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়

একটি তৈরি পোশাক কারখানার জন্য সরকারি ১৭টি প্রতিষ্ঠান হতে বিভিন্ন প্রকার একাধিক সনদ নিতে হয়। মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে একজন উদ্যোক্তাকে এ সকল প্রতিষ্ঠান হতে সনদ গ্রহণ করার জন্য অতিরিক্ত প্রায় ৭-২০ লাখ টাকা বিভিন্ন পর্যায়ে প্রদান করতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, কারখানার ত্রুটিভেদে এ অর্থের পরিমাণ আরও অনেক বেশি হয়। সরকারি সেবা প্রদানকারী এ সংস্থাগুলোর মধ্যে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে (রাজউক) বেশি অর্থ প্রদান করতে হয়। ভবন নির্মাণ নকশা অনুমোদনের জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে যথাক্রমে ১ লাখ ২৪ হাজার থেকে ৩ লাখ ৫৪ হাজার টাকা ও ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য আরও ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা দিতে হয়। রাজউক ছাড়া সরকারি আরও যে সব প্রতিষ্ঠানকে এই অর্থ বা ঘুষ দিতে হয় সেগুলো হলো- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদপ্তরকে ৫ থেকে ৪০ হাজার, শ্রম পরিদপ্তরে ২ থেকে ১ লাখ, সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা বা ইউনিয়নে ১ হাজার থেকে ৩ লাখ, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সে ৫ থেকে ৪০ হাজার, বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ে ৫০ থেকে ৬০ হাজার, পরিবেশ অধিদপ্তরে ১০ থেকে ২০ হাজার, ইপিবিতে ২ থেকে ১০ হাজার, বিনিয়োগ বোর্ডে ১০ থেকে ২০ হাজার, আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে ৩০ থেকে ৫০ হাজার, এনবিআরে ৫ থেকে ২৫ হাজার, কাস্টম অ্যান্ড এক্সাইজে ১ লাখ থেকে ২লাখ ৫০ হাজার, জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে ৩০ থেকে ৪০ হাজার, ডেসা বা ডেসকোকে ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ, তিতাস গ্যাসে ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ এবং ওয়াসায় ১০ থেকে ৫০ হাজার টাকা অতিরিক্ত দিতে হয়।

প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদনকে মূল্যায়ন করে থাকে। আবার, আমদানী কারক দেশের সরকারি সংস্থা অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রতিবেদন চেয়ে থাকে। ফলে, এ ধরনের নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা কার্যক্রমকে কারখানা মালিক ও বায়ার উভয়ই গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

সারণি ৩: কারখানা প্রতিষ্ঠায় নিয়ম বহির্ভূত অর্থ আদায়

সংস্থা	সেবার ধরন	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
১.কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর	কারখানার লাইসেন্স প্রদান	৩০,০০০ থেকে ৪০,০০০
	নবায়ন	৫,০০০ থেকে ১০,০০০
২. শ্রম পরিদপ্তর	শ্রম লাইসেন্স ও ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন	২,০০০ থেকে ৫,০০০
	ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন বন্ধ করার জন্য	৫০,০০০ থেকে ১,০০,০০০
৩. রাজউক	ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র (প্যাকেজ)	৩০,০০০ থেকে ৩৫,০০০
	ভবন নির্মাণের নকশা অনুমোদন	১,২৪,০০০ থেকে ৩,৫৪,০০০
৪.সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ ইউনিয়ন	ট্রেড লাইসেন্স	১,০০০ থেকে ২৫,০০০
	ভবন নির্মাণের নকশা অনুমোদন/ কারখানা নির্মাণ ছাড়পত্র/অনাপত্তি প্রদানে	৫০,০০০ থেকে ৩,০০,০০০
৫. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	অগ্নি নির্বাপক ও নিরাপত্তা বিষয়ক লাইসেন্স	৩০,০০০ থেকে ৪০,০০০
	নবায়ন	৫,০০০ থেকে ১০,০০০
৬. বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	বয়লার লাইসেন্স	৫০,০০০ থেকে ৬০,০০০
৭. পরিবেশ অধিদপ্তর	পরিবেশ বিষয়ক লাইসেন্স	৫০,০০০ থেকে ১,২০,০০০
	নবায়ন	১০,০০০ থেকে ৩০,০০০
৮. বিনিয়োগ বোর্ড	ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেট	১০,০০০ থেকে ৫০,০০০
৯. রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	তালিকাভুক্তি সনদ	৮,০০০ থেকে ১০,০০০
	তালিকাভুক্তি নবায়ন	২,০০০ থেকে ২,০০০
১০, প্রধান আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	আমদানি নিবন্ধন সনদ ও রপ্তানি নিবন্ধন সনদ	৩০,০০০ থেকে ৫০,০০০
	নবায়ন	৪,০০০ থেকে ৫,০০০
১১. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	ভ্যাট নিবন্ধন	৫,০০০ থেকে ২৫০০০
১২. কাস্টমস এন্ড এক্সাইজ	বন্ড লাইসেন্স	১,০০,০০০ থেকে ২,৫০,০০০
১৩. জয়েন্ট স্টক কোম্পানি	নিবন্ধন	৩০,০০০ থেকে ৪০,০০০
১৪. ডেসা/ ডেসকো	বিদ্যুৎ সংযোগ	৫০,০০০ থেকে ১,০০,০০০
১৫. তিতাস গ্যাস	গ্যাস সংযোগ	৫০,০০০ থেকে ১,০০,০০০
১৬. বিটিসিএল	টেলিফোন সংযোগ	--
১৭. ওয়াসা	পানির সংযোগ	১০,০০০ থেকে ৫০,০০০

তথ্যসূত্র: সংশ্লিষ্ট মুখ্য তথ্যদাতা।

৩.১০ উপসংহার

তৈরি পোশাক খাতে উপরোক্ত বিভিন্ন অংশীজন হতে সেবা গ্রহণে প্রত্যেক পর্যায়ে মালিক পক্ষ ও কর্মকর্তাদের মধ্যে দুর্নীতির মিথস্ক্রিয়া সৃষ্টি হয়। দুর্নীতি কখনো জোরপূর্বক আবার কখনো সমঝোতার মাধ্যমে হয়ে থাকে। সরকারি অংশীজনদের সক্ষমতার ঘাটতি ও সীমাবদ্ধতার সুযোগে প্রতিষ্ঠানগুলো অনিয়মে জড়িয়ে পড়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোর আভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও সংবেদনশীলতার বিদ্যমান কাঠামোগত দুর্বলতাকে নির্দেশ করে। আবার মালিকপক্ষ নিজেদের কারখানার নিম্ন কর্ম-পরিবেশ, ভবনের কাঠামোগত দুর্বলতা ও কমপ্লায়েন্স লোকচক্ষুর আড়ালে রেখে ব্যবসা পরিচালনায় সরকারি তদারকি প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে আঁতাতের মাধ্যমে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে শ্রমিক অধিকার রক্ষায় শ্রমিক সংগঠনগুলোও তাদের যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে না। ট্রেড ইউনিয়নগুলোর মধ্যে আইনানুগভাবে নেতৃত্বের অনুপস্থিতি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মালিকপক্ষের স্বার্থে কার্যক্রম পরিচালনা, ফেডারেশন নেতৃত্বে কারখানা পর্যায় ট্রেড ইউনিয়নগুলোর অনুপস্থিতি এবং রাজনৈতিক বিভাজন শ্রমিক সংগঠনগুলো তাদের অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারে না। আবার, বায়ার ও মালিকের অতি মুনাফা মানসিকতার কারণে কারখানার নিরাপত্তা, শ্রমিক অধিকার বিষয়ের চেয়ে সস্তায় পণ্য উৎপাদনের প্রবণতাকে কেন্দ্র করে বায়ারও অনিয়মে জড়িয়ে পড়ে। অথচ দেশীয় আইন কিংবা অন্য কোন কার্যকর পদ্ধতি না থাকার কারণে বায়ার-মালিক আন্তক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ এ খাতে বিভিন্ন পর্যায়ে সংগঠিত অনিয়ম ও দুর্নীতির একীভবন (fusion) সংঘটিত হয়েছে।

অধ্যায় চার

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব বিশ্লেষণ

৪.১ তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন ঘাটতির কারণ

ক. তৈরি পোশাক খাতে সার্বিক তত্ত্বাবধানে কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতি এবং বিদ্যমান বিভিন্ন সরকারি বিভাগ ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয়হীনতা

দেশের তৈরি পোশাক খাতের সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব কোনো সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের ওপর নেই। কারখানা স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের অনেকগুলো সংস্থা রয়েছে যারা অনুমোদনকারী ও তদারকি কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু 'লিড মিনিস্ট্রি/ কর্তৃপক্ষ' না থাকার কারণে এসব সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া এসব সংস্থার বিরুদ্ধে দায়িত্বহীনতা ও দুর্নীতির অভিযোগও রয়েছে। ফলে একদিকে যেমন অসৎ কারখানা মালিকরা তদারকি সংস্থাগুলোর সাথে যোগ-সাজশে অবৈধ সুবিধার বিনিময়ে কারখানাগুলোর সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে না, অন্যদিকে সৎ মালিকরা হয়রানির শিকার হন[৯১] এবং শ্রমিক নিরাপত্তা ঝুঁকিতে নিপতিত হয়। প্রাকৃতিক বা মানুষ্য সৃষ্ট দুর্ঘটনা কিংবা শ্রমিক অসন্তোষ ও আন্দোলন প্রশমনে যথাযথ দায়িত্ব পালন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনো মন্ত্রণালয় দায়িত্ব নিতে চায় না, বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতের সাথে সরাসরি জড়িত তিনটি মন্ত্রণালয় (শ্রম ও কর্মসংস্থান, বাণিজ্য, এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়) দায়িত্ব এড়িয়ে যায়। সরকারের রুলস অব বিজনেস অনুসারে পোশাক খাতের বিষয়গুলো বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত থাকার কথা। কিন্তু রুলস অব বিজনেসে পোশাক খাতের টেক্সটাইল ও নিট কারখানার বিষয় উল্লেখ থাকলেও 'তৈরি পোশাক' শিল্পকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।[৯২] ফলে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় 'তৈরি পোশাক' সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। আবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় শুধু তৈরি পোশাক রপ্তানির বিষয়টি দেখে থাকে, অন্য বিষয়গুলো তাদের এখতিয়ারভুক্ত নয়। অন্যদিকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অন্যান্য শিল্পের ন্যায় এ খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের শ্রম ও কর্মসংস্থানের বিষয়টি তত্ত্বাবধান করে থাকে। ফলে সার্বিক তত্ত্বাবধানের কোনো কর্তৃপক্ষ না থাকার কারণে অনেক সময় এ খাতের সাথে জড়িত নয় এমন অন্য মন্ত্রণালয় এ খাতের কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে পড়ে (যেমন সাম্প্রতিক সময়ে মজুরি বৃদ্ধির শ্রমিক আন্দোলনে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রি বিভিন্নভাবে জড়িয়ে পড়ে)। অথচ খাত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কোনো জোরালো ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় না। ফলে এ খাতের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে একক এবং দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত প্রণয়নে দীর্ঘসূত্রতা ও বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

খ. সংশ্লিষ্ট তদারকি প্রতিষ্ঠানগুলোর সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

স্বাধীনতা পরবর্তী সাহায্য নির্ভর বাংলাদেশ মূলত তৈরি পোশাক বাণিজ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা রাখার ফলে আজ বাণিজ্য নির্ভর দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। কিন্তু দ্রুত বিকাশমান শিল্পের সাথে সরকারি বিভিন্ন তদারকি প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়নি। অপরদিকে, অতিরিক্ত ও দ্রুত মুনাফার লোভে যত্রতত্র গড়ে ওঠা পোশাক কারখানাগুলোর অবকাঠামো এবং নিরাপত্তার দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠান স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ের জনবল এবং প্রযুক্তি দিয়ে তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ কারণে প্রতিষ্ঠানগুলোর তদারকি কার্য হয় দুর্বল।

গ. শ্রম আইনের সীমাবদ্ধতা, পর্যাপ্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি ও বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা

বর্তমান শ্রম আইন পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে অনেক বেশি উন্নত এবং আধুনিক হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর সীমাবদ্ধতা এবং মালিক পক্ষের জন্য পর্যাপ্ত শাস্তির ব্যবস্থা না থাকায় অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। এছাড়া ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী উল্লেখ না থাকা, মালিকদের বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তির বিধান না থাকা অথবা কর্মকালীন দুর্ঘটনায় শ্রমিকদের অপর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের বিধান অনিয়ম ও দুর্নীতিকে উৎসাহিত করছে। অন্যদিকে সরকারি তদারকি প্রতিষ্ঠান যেমন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের তাৎক্ষণিক শাস্তি প্রদানের কোনো বিধান নেই, শুধুমাত্র শ্রম আদালতে মামলা করতে পারে। কিন্তু শ্রম আদালতে মামলাজট এবং দীর্ঘসূত্রতা পরিলক্ষিত হয়। মামলা পরিচালনা করা স্বল্প পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত শ্রমিকের জন্য কঠিন এবং প্রায় অসম্ভব। এ কারণে মালিকেরা সহজে অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়ে যায়।

ঘ. কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়নে মালিকদের প্রায়োগিক দুর্বলতা

শ্রমিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতকল্পে আন্তর্জাতিকভাবে নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসরণ ও বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা থাকলেও বাংলাদেশে অধিকাংশ তৈরি পোশাক কারখানায় কমপ্লায়েন্স সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয় না। এর একটি কারণ হিসেবে

---

[৯১] বিস্তারিত দেখুন- *শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট*, অষ্টম জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, সেপ্টেম্বর ২০০৬ ।

[৯২] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩।

মালিকদের প্রায়োগিক দুর্বলতাকে চিহ্নিত করা যায়। প্রায়োগিক দুর্বলতা হিসেবে শ্রমমান বৃদ্ধি ও শ্রমিক কল্যাণ বিষয়ে মালিকদের অসচেতনতা, অনীহা, সঠিক প্রশিক্ষণের অভাব ও ব্যবস্থাপনার দক্ষতার অভাবকে চিহ্নিত করা যায়। যার কারণে মালিক বিভিন্নভাবে কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়নের মানদণ্ড নিশ্চিত করতে পারে না।

ঙ. ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে মালিকদের নেতিবাচক মনোভাব ও আইনি জটিলতা

তৈরি পোশাক খাতে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে মালিকদের নেতিবাচক মানোভাব এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত জটিলতা বিদ্যমান রয়েছে। শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত করা এবং শ্রমিক স্বার্থের বিষয়ে যৌথ দরকষাকষিতে ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকারিতা আন্তর্জাতিকভাবে এবং বাংলাদেশী আইনে স্বীকৃত। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বিভিন্ন কারণে সমালোচিত হয়েছে। অনেকের মতে এসব প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা নষ্ট হওয়ার পেছনে ট্রেড ইউনিয়নের সাথে জড়িত বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক কারখানাগুলোতে অধিকাংশ মালিক ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে একই ধারণা পোষণ করে। তাদের মতে, ট্রেড ইউনিয়ন ব্যবসা পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে, কারখানার অভ্যন্তরীণ কর্ম-পরিবেশ নষ্ট ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, এবং বাংলাদেশের মজুরি বায়ারদের আকৃষ্ট করে তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি করবে। অপরদিকে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক মালিকের নেতিবাচক মনোভাবের একটি কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এ ক্ষেত্রে শ্রমিকদের বিভিন্ন রাজনৈতিক তৎপরতায় যেমন মিছিল, মিটিং, আন্দোলন অথবা রাজনৈতিক স্বার্থে কারখানার ক্ষতি সাধনে ব্যবহার হওয়ার ঝুঁকি মালিকদের অতিমাত্রায় প্রভাবিত করে। যার কারণে মালিক স্থানীয় ও জাতীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং প্রশাসনিক প্রভাব খাটিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন সংস্কৃতি প্রতিহত করার জন্য বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির আশ্রয় নেয়।

চ. অপর্যাপ্ত মজুরি কাঠামো

আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শ্রমিকদের মজুরি সর্বনিম্ন। আবার দেশের অভ্যন্তরে অন্যান্য খাতের চেয়েও সর্বনিম্ন মজুরি তৈরি পোশাক খাতে।[৯৩] মালিকপক্ষের মতে শ্রমিকের কম মজুরি বায়ারদেরকে এ দেশে আকৃষ্ট করার অন্যতম কারণ। আইন অনুযায়ী তৈরি পোশাক খাতে শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি সরকার কর্তৃক গঠিত মজুরি বোর্ড নির্ধারণ করে থাকে।[৯৪] সর্বপ্রথম ১৯৮৫ সালে সর্বনিম্ন ৬২৭ টাকা মজুরি নির্ধারণ করা হয়। রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর পোশাক খাতে শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি শ্রমিকের জীবনমানের জন্য যথেষ্ট নয় বলে দেশ-বিদেশে আলোচিত হয়। বিশেষজ্ঞ ও শ্রমিকদের মতে তৈরি পোশাক খাতে অস্থিতিশীলতা ও শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত না হওয়ার পেছনে মূল কারণ হচ্ছে কম মজুরি। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, তৈরি পোশাক খাতে বর্তমান বেতন শুধু অল্পই নয় বরং জীবন ধারণের জন্যও পর্যাপ্ত নয়। শ্রম আইন অনুযায়ী ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ১০টি বিষয় বিবেচনা করতে হয়।[৯৫] কিন্তু মালিকপক্ষ কর্তৃক মজুরি বোর্ডে উৎপাদন খরচ, উৎপাদনশীলতা, মুদ্রাস্ফীতি ও ব্যবসায়িক সামর্থ্য ইত্যাদি বিষয়গুলোর ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করে কম মজুরির পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়, যদিও বিভিন্ন গবেষণায় ন্যূনতম মজুরি জীবনমানের সাথে সংগতি রেখে বৃদ্ধির পক্ষে যুক্তি দেখানো হয়েছে।[৯৬]

ছ. মালিক ও বায়ারদের অতিরিক্ত ও দ্রুত মুনাফার প্রবণতা

বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের ক্রমবিকাশ বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পাই পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর ওপর আরোপিত কোটা পদ্ধতি এবং এসব দেশের শ্রমমান বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশ বায়ারদের কাছে আকর্ষণীয় স্থানে পরিণত হয়। বায়ারদের আকর্ষণের মূল কারণ অল্প মজুরিতে সহজলভ্য শ্রম এবং বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের মাধ্যমে উৎপাদন চাহিদা সহজে নিশ্চিত করা যায়। আবার সরকারি বিপুল নীতি সুবিধা মুক্তবাজার অর্থনীতিকে সহজে সম্প্রসারিত করছে, ফলে অতি দ্রুত তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করছে এবং উদ্যোক্তাদের কাছে আকর্ষণীয় ব্যবসা হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। কিন্তু এর সাথে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেগুলো এ খাত তদারকি করে থাকে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়নি, যে সুযোগে মালিক পক্ষ অতিরিক্ত ও দ্রুত মুনাফার লোভে সমঝোতার ভিত্তিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। অপরদিকে বায়ারদের অতিরিক্ত মুনাফা

---

[৯৩] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৩।

[৯৪] তৈরি পোশাক খাতে এ পর্যন্ত গঠিত পাঁচটি ন্যূনতম মজুরি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি হচ্ছে যথাক্রমে - ১৯৮৫ (৬২৭ টাকা), ১৯৯৪ (৯৩০ টাকা), ২০০৬ (১৬৬২টাকা), ২০১০ (৩০০০টাকা) এবং ২০১৩ (৫৩০০টাকা প্রস্তাবিত)।

[৯৫] নিম্নতম মজুরি নির্ধারণের সুপারিশ প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়- জীবন যাপন ব্যয়; জীবনযাপনের মান, উৎপাদন খরচ; উৎপাদনশীলতা; উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য; মুদ্রাস্ফীতি; কাজের ধরন, ঝুঁকি ও মান; ব্যবসায়ীক সামর্থ; দেশের এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় (ধারা ১৪১)।

[৯৬] সিপিডি অর্থনৈতিক বিভিন্ন সূচক ও মডেলের সাহায্যে তৈরি পোশাক খাতের মজুরি কাঠামো বিশ্লেষণ করে ন্যূনতম মজুরি ৮২০০টাকা করার প্রস্তাব করে। বিস্তারিত দেখুন, www.cpd.org.bd/wp-content/uploads/2013/09/CPD-on-Minimum-Wage.pdf। আবার সোয়েবের (২০১৩) মতে, জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালোরি, খাবার খরচ, উৎপাদন খরচ; উৎপাদনশীলতা, দারিদ্র্য ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণ করে ন্যূনতম মজুরি ৫৫৪৭.৫০ টাকা করা যেতে পারে।

লোভ বিভিন্ন অনিয়ম এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা তৈরি করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রমিক কর্ম-পরিবেশ, অধিকার ও নিরাপত্তার তুলনায় স্বল্প উৎপাদন খরচে মানসম্মত পণ্য প্রাপ্তি তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে।

জ. নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগে ব্যবসা ও রাজনীতির প্রভাব এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব

তৈরি পোশাক খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন মেয়াদে আইন ও নীতি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে মালিক পক্ষের ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক প্রভাব এবং পোশাক ব্যবসায়ি রাজনীতিবিদদের স্বার্থের দ্বন্দ্বে এসকল উদ্যোগ ফলপ্রসূ হয়নি। বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশের জন্য ১৯৮৯ সালে তৎকালীন সরকার স্বায়ত্তশাসিত 'অ্যাপারেল বোর্ড' গঠনের খসড়া প্রস্তাব অনুমোদন করে। পরবর্তী সরকারের আমলে (১৯৯১-১৯৯৫) বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ১৯৯৯ সালের অক্টোবরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভার বৈঠকে আবারও বোর্ড গঠনের প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়। এতে বলা হয়, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) বস্ত্র সেল তৈরি পোশাক রপ্তানি সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করলেও সার্বিক বিষয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু তৎকালীন অর্থ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের আপত্তির মুখে তা আর হয়নি। ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে এই বোর্ড গঠনের উদ্যোগ নিলে 'নির্বাচিত সরকার অ্যাপারেল বোর্ড গঠন করুক' বলে তা পিছিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২০০২ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এই উদ্যোগ গ্রহণ করলে এবার বিরোধিতা করে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়। ২০০৫-০৬ সালে তৈরি পোশাক খাতে শ্রমিক আন্দোলনের ফলে গঠিত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি তৈরি পোশাক খাতের জন্য স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় গঠনের সুপারিশ করে। পরবর্তী সরকার মন্ত্রণালয় গঠনের পূর্ববর্তী সুপারিশের বাইরে এসে ২০১০ সালে পুনরায় বস্ত্র ও পোশাক শিল্প বোর্ড গঠনের জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় আইনের খসড়া প্রণয়ন করে। অ্যাপারেল বোর্ড গঠন প্রসঙ্গে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী মন্তব্য করেন, "এই বোর্ড গঠিত হলে কারখানার কর্ম-পরিবেশ ভালো হবে, শ্রমিকের মজুরি নিশ্চিত হবে এবং বিদেশি ক্রেতারা কম মূল্যে পোশাক কিনতে পারবেন না। ফলে শ্রমিকদের ঠকাতেও পারবেন না মালিকেরা"।[৯৭] কিন্তু ২০১১ সালে প্রস্তাবটি মন্ত্রিসভায় উত্থাপন করা হলে অনুমোদিত হয়নি। এ থেকে দেখা যায়, তৈরি পোশাক খাতের জন্য পৃথক বোর্ড বা মন্ত্রণালয় গঠনের প্রশ্নে বিভিন্ন সরকারের মধ্যে ঐকমত্য এবং ধারাবাহিকতার অভাব ছিল। মন্ত্রণালয় কর্মকর্তাদের মতে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ গঠন না করার নেপথ্যে মন্ত্রণালয়গুলোর হীনম্মন্যতার পাশাপাশি কারখানা মালিকদের বিরোধিতা কাজ করেছে বলে মনে করেন। বিশেষজ্ঞদের মতে পোশাক খাতকে একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হলে এ খাতের টেকসই উন্নয়নে সহায়ক হবে।

ঝ. বিজিএমই এর কার্যকর ভূমিকা ও জবাবদিহিতার অভাব

তৈরি পোশাক খাতে সামগ্রিক উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করা মালিক সংগঠন বিজিএমইএ এর গঠনতন্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ নামমাত্র নিরীক্ষা এবং কার্যকর জবাবদিহিতা না থাকায় রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে নীতি-সুবিধা আদায় এবং শ্রমিক স্বার্থ অবদমিত করার জন্য অর্থের বিনিময়ে ফেডারেশন নেতাদের ব্যবহার বিজিএমইএর কার্যক্রমে স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির জন্ম দেয়। অপরদিকে দুর্নীতি ও অনিয়মের সাথে জড়িত মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে বিজিএমইএ এর কার্যকর সহায়ক ভূমিকা লক্ষ করা যায় না। বিজিএমইএ'র দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকার কারণে কারখানা পর্যায়ে মালিক সংগঠন হিসেবে বিজিএমইএ'র নির্দেশ পালনে গাফিলতি লক্ষ করা যায়।

৪.২ তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের ঘাটতির ফলাফল ও প্রভাব

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, সুশাসনের ঘাটতির কারণে তৈরি পোশাক কারখানায় কমপ্লায়েন্স ঘাটতি, অগ্নি-দুর্ঘটনা, ভবন ধস, আইন ও মানবাধিকার লঙ্ঘন, মালিক-শ্রমিক আস্থার সংকট, কার্যকর শ্রমিক সংগঠনের অনুপস্থিতি এবং আঁতাতের মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহার ও অনিয়ম-দুর্নীতির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতির কারণে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যেমন সমন্বয়হীনতা রয়েছে তেমনি নিরাপদ কর্ম-পরিবেশ, শ্রমিকের মজুরি, পণ্যমূল্য ইত্যাদি নিশ্চিত করা যায় না। কিন্তু নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রভাবে এখনো কোনো কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ গঠন করা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শকদের কার্যকর পরিদর্শন ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও জবাবদিহিতার ঘাটতি তৈরি পোশাক খাতে কমপ্লায়েন্স ব্যাহত করছে, যা এ খাতে অগ্নি-দুর্ঘটনা, ভবন ধস, আইন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের মত মানবিক বিপর্যয় ঘটায়, এবং শ্রমিকদের মধ্যে নিরাপত্তা আতংক ও শ্রমিক অসন্তোষের জন্ম দেয়। আবার শ্রম নিবিড় এ খাতের প্রাণ শ্রমিকের অধিকার আদায় ও সচেতনা সৃষ্টির মুখ্য দায়িত্ব পালনকারী ট্রেড ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত দুর্বলতা, রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ও বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ট্রেড ইউনিয়নকে ধীরে ধীরে দুর্বল করে ফেলে, ফলে কার্যকর শ্রমিক-বান্ধব ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠেনি। এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবে ট্রেড ইউনিয়নগুলো শ্রমিক অধিকারের বিষয়ে কার্যকর কাঠামো গঠনে ব্যর্থ হয়, যা উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাহত করে, উপর্যুক্ত কর্ম-পরিবেশ নষ্ট করে এবং সর্বোপরি শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না।

---

[৯৭] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৩।

সামগ্রিক প্রভাবে এ খাতে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় শ্রমিকেরা মৃত্যু ও পঙ্গুত্ব বরণ করে এবং তাদের জীবনযাত্রার মানে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তৈরি পোশাক খাতে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়, এবং এ কারণে ব্র্যান্ড সুনাম ক্ষুণ্ন হয় ও রপ্তানি হ্রাস পায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০১৩ সালের জুন মাসে জিএসপি (Generalized System of Preferences, GSP)[৯৮] সুবিধা বাতিল করে। একইভাবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পক্ষ থেকেও জিএসপি বাতিলের হুমকি প্রকাশিত হয়। তৈরি পোশাক খাতে অস্থিরতার প্রভাবে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি এবং সংশ্লিষ্ট সম্পূরক শিল্পে গতিশীলতা হ্রাস পায় এবং সর্বোপরি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।

চিত্র ১: তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব বিশ্লেষণ

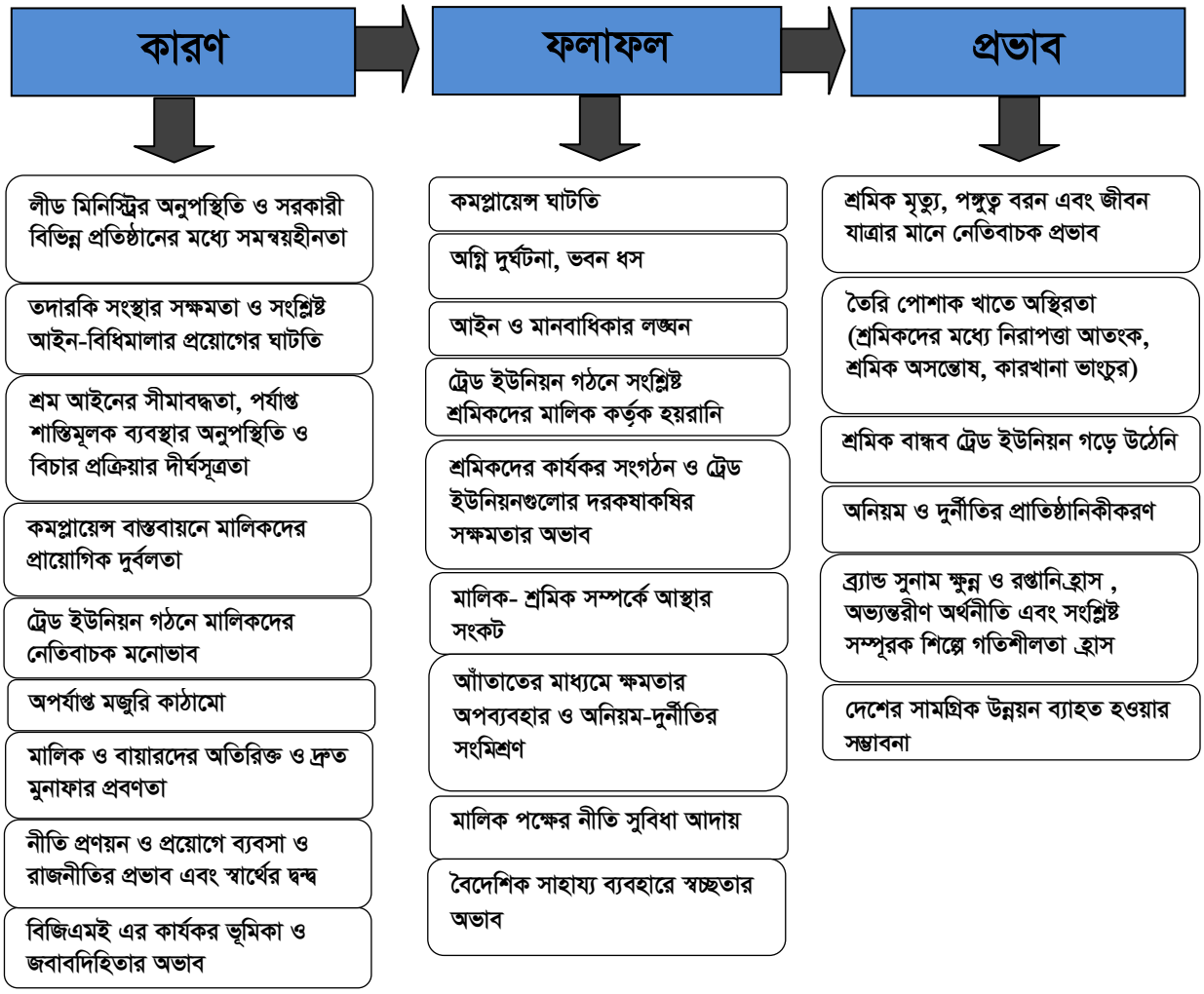

৪.৩ উপসংহার

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের সমস্যার কারণ, ফলাফল ও প্রভাব বিশ্লেষণে দেখা যায়, সুশাসন ঘাটতির কারণসমূহ দীর্ঘদিনের অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। আর্থিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে কিংবা সার্বিকভাবে এ খাতে কোন কার্যকর জবাবদিহিতার ও আইনের শাসনের দৃশ্যমান কাঠামো গড়ে ওঠেনি। ফলে এ খাতে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সংগঠিত হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এ খাতের সাধারণ শ্রমিক। অথচ এ খাতের পুঞ্জীভূত দুর্নীতির সাথে সাধারণ শ্রমিক জড়িত নয়।

[৯৮] জিএসপি বলতে বোঝায়, আমদানিকারক রাষ্ট্রে সুবিধাভোগী উন্নয়নশীল দেশের উৎপাদিত পণ্য শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক 'ট্রেড আইন, ১৯৭৪' অনুসারে ১ জানুয়ারি ১৯৭৬ সাল থেকে সুবিধাভোগী ১২৬টি দেশের ৫,০০০ ধরনের পণ্য শুল্ক মুক্তভাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি সুবিধা দেয়া হয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্তক বাংলাদেশে জিএসপি সুবিধাপ্রাপ্ত পণ্যের মধ্যে রয়েছে- প্রায় সকল ম্যানুফেকচারিং দ্রব্য, বিভিন্ন ধরণের ক্যামিকেল, নির্মাণ পাথর, জ্বয়েলারি, কার্পেট, কৃষি ও মৎস্যজাত দ্রব্য। কিন্তু বাংলাদেশে উৎপাদিত তৈরি পোশাক, ঘড়ি, হাত ব্যগ ও লাগেজ পণ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে জিএসপি সুবিধা পায় না।

অধ্যায় পাঁচ

উপসংহার ও সুপারিশ

৫.১ উপসংহার

বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে তৈরি পোশাক খাতের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বায়নের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের দ্বিতীয় অবস্থান নব্য উদার অর্থনীতিতে (Neo-Liberal Economy) বাংলাদেশের অবস্থানকে নির্দেশ করে। এ ধরনের বৈষয়িক পরিবেশে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা এবং সংকট ব্যবস্থাপনায় (Crisis management) কাঠামোগত পরিবর্তনের (Structural adjustment) অন্যতম উপাদান হচ্ছে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা (ডেভিড হারবি, ২০০৫)। রানা প্লাজা দুর্ঘটনা বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি খাতে পুঞ্জীভূত সুশাসন ব্যর্থতাকে প্রকাশ করে। বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পে সংকট উত্তরণ, কারখানার নিরাপদ কর্ম-পরিবেশ ও শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং অর্থনীতিতে খাতের প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন এ খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। গবেষণায় দেখা যায়, তৈরি পোশাক খাতে স্বতন্ত্র একটি কারখানার অভ্যন্তরে যেমন সুশাসনের বিভিন্ন উপাদানের অনুপস্থিতি রয়েছে তেমনি সামগ্রিকভাবে এ খাতে সুশাসনের অভাব রয়েছে।

সুশাসনের অন্যতম উপাদান হচ্ছে দায়িত্বের প্রতিটি স্তরে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু গবেষণায় দেখা যায় তৈরি পোশাক খাতে জড়িত বিভিন্ন অংশীজনের কাজের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার বিষয়টি কার্যকর নয়। একজন পরিদর্শক কর্তৃক কারখানা পরিদর্শনে ব্যক্তিগত সুবিধার বিনিময়ে ছাড় প্রদান কিংবা মালিক, শ্রমিক সংগঠন বা বায়ার কর্তৃক সংগঠিত কার্যক্রমের কার্যকর জবাবদিহিতা কাঠামোর ঘাটতি রয়েছে। যেমন অংশীজনের স্ব-নিয়ন্ত্রণের (Self regulatory system) কার্যকর ব্যবস্থার অনুপস্থিতি রয়েছে। অপরদিকে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করায় কার্যকর ব্যবস্থার অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

আইন অমান্যকারী অংশীজনের বিরুদ্ধে আইনানুগভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নজির প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বিশেষ করে দুর্ঘটনার জন্য মালিকপক্ষের শাস্তি বৃদ্ধি বা কারখানা পরিদর্শকদের জবাবদিহির বিষয়টি শ্রম আইনে উল্লেখ না থাকায় নিরাপদ কর্ম-পরিবেশ, শ্রমিক অধিকার, কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়ন ও তদারকিতে অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে জড়িত সংঘটক ও অনুঘটকদের শাস্তি বিধানের বিষয়টি এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সরকারি অংশীজনের বিদ্যমান স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের শাস্তিমূলক ব্যবস্থাটি যেমন স্বচ্ছ নয়, তেমনি দুর্ঘটনায় জড়িত মালিকের শাস্তির উদাহরণ এখনো স্থাপিত হয়নি। অর্থাৎ এ খাতে আইনের শাসন ও সংবেদনশীলতার ঘাটতি রয়েছে বলে দেখা যাচ্ছে।

সুশাসন ঘাটতির কারণে তৈরি পোশাক খাতে ব্যবসা সম্প্রসারণ ও পরিচালনায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার, সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির মিথস্ক্রিয়া সৃষ্টি হয় যা অধিক মুনাফা অর্জনের প্রবণতা তৈরি করে এবং শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে, সর্বোপরি যা বড় ধরনের দুর্ঘটনার দীর্ঘমেয়াদি ফাঁদ তৈরি করতে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। এ খাতের দুর্ঘটনা ও অস্থিতিশীলতা নিছক কোনো দুর্ঘটনা নয়, বরং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনের দায়িত্ব পালনে অনিয়ম-দুর্নীতি, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সংবেদনশীলতার ঘাটতি ও সর্বোপরি এ শিল্পের সুশাসনের সার্বিক ব্যর্থতার ফলাফল। এসব অনিয়ম ও সমস্যা হতে উত্তরণে সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে এ শিল্পের পরিকল্পিত বিকাশ ও টেকসই উন্নয়নে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

৫.২ সুপারিশ

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ হতে তৈরি পোশাক খাতের সমস্যা থেকে উত্তরণে নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রস্তাব করা যাচ্ছে।

ক. নীতি-নির্ধারণ সংক্রান্ত:

১. তৈরি পোশাক খাতে দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সমন্বয় ও তদারকি জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনে কারখানা পরিদর্শন ও কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়নের জন্য একটি অধিদপ্তর গঠন করতে হবে। মন্ত্রণালয় গঠন না হওয়া পর্যন্ত শিল্প মন্ত্রণালয় এর সচিবের নেতৃত্বে একটি অন্তবর্তীকালীন One Stop সেল গঠন করা যেতে পারে ।

২. আইএলও কনভেনশনের (২৯, ৮৭, ৯৮, ১০৫) সাথে সামঞ্জস্য রেখে শ্রম আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে এবং 'শ্রম বিধিমালা' প্রণয়নে তৈরি পোশাক খাতের বিষয়গুলো গুরুত্ব দিতে হবে।

৩. কমপ্লায়েন্স ঘাটতির কারণে সংঘটিত দুর্ঘটনার জন্য সংশ্লিষ্ট কারখানা মালিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করার জন্য শ্রম আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে।

৪. কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধি ও প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

৫. অগ্নি বা ভবন ধস সংক্রান্ত মামলা শ্রম আদালতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দ্রুত সম্পন্ন করার বিধান করতে হবে।

৬. পোশাক কারখানা অধ্যুষিত এলাকায় অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও জনবলসহ অগ্নি-নির্বাপক স্টেশন স্থাপন এবং পোশাক খাতের জন্য বিশেষায়িত অগ্নি নিরাপত্তা পরিদর্শক সেল গঠন করতে হবে।

৭. প্রতি কারখানায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের সুনির্দিষ্ট কার্যাবলীর 'বিধিমালা' প্রণয়ন করতে হবে।

৮. তৈরি পোশাক কারখানার মালিকরা তৈরি পোশাক খাতসংশ্লিষ্ট সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোতে যেন সদস্য হতে না পারেন তা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. শিল্পের পরিকল্পিত বিকাশের জন্য সরকার প্রতিশ্রুত পোশাক শিল্প পল্লিতে কারখানা স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য শক্তিশালী তদারকি কমিটি গঠন করতে হবে এবং একাধিক পোশাক পল্লি স্থাপন করতে হবে।

১০. শ্রম আইনের ২৩২ (৩) ধারা অনুসারে তৈরি পোশাক খাতের জন্য একটি কেন্দ্রীয় শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠনে প্রতিষ্ঠানের মোট মুনাফার পরিবর্তে রপ্তানিকৃত পোশাকের সংখ্যা প্রতি ১ থেকে ১.৫ সেন্ট কল্যাণ তহবিলে প্রদান করতে হবে; এ ক্ষেত্রে আলোচনা সাপেক্ষে বায়ার-মালিক অনুপাত হতে পারে ৭৫:২৫ এবং তহবিল পরিচালনা বোর্ডে নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

খ. অংশীজন প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত:

১১. তদারকি সংস্থাগুলোর দক্ষতা, জনবল, অর্থবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

১২. শ্রম পরিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে হবে।

১৩. রাজউকসহ অন্যান্য নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষাধীন এলাকায় অবস্থিত ইউনিয়ন পরিষদের ভবন নির্মাণ ও নকশা অনুমোদন সংক্রান্ত ক্ষমতা রহিত করতে হবে এবং জেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে জেলা গণপূর্ত বিভাগের মাধ্যমে ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত ছাড়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪. মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় ফায়ার সার্ভিস ও রাজউককে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

১৫. ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একটি ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের আবেদন প্রক্রিয়ায় কত সময় লেগেছে, নিবন্ধন দেয়া হয়েছে কিনা, না দিলে কেন দেওয়া হলো না তা শ্রম পরিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

১৬. ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনকে রাজনৈতিক দল ও বিজিএমইএ'র সম্পৃক্ততা ত্যাগ করে শ্রমিক স্বার্থে কাজ করতে হবে এবং নেতৃত্ব আইন অনুযায়ী গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত করতে হবে।

১৭. প্রতিটি তৈরি পোশাক কারখানার কমপ্লায়েন্স, অগ্নি ও ভবনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরিদর্শনের তথ্য নিয়ে একটি প্রকাশ্য তথ্য ভান্ডার গড়ে তুলতে হবে। কারখানাগুলোর যেসব ত্রুটি পাওয়া যাবে এবং এ জন্য যে শাস্তি সুপারিশ করা হয়েছে বা প্রদান করা হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট পরিদর্শকের নামসহ তথ্য ভান্ডারে সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৮. পোশাক কারখানার সকল পর্যায়ের শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রশিক্ষণে সরকার, বিজিএমইএ এবং বায়ারদের পৃষ্ঠপোষকতায় সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৯. শ্রমিকদের জন্য জরুরি যোগাযোগের ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ অগ্নি-নিরোধক পরিচয়পত্র প্রদান এবং হাজিরা খাতার নিরাপদ সংরক্ষণ করতে হবে।

২০. তৈরি পোশাক কারখানার কর্ম-পরিবেশের জন্য একটি একক আচরণ-বিধিমালা (Uniform Code of Conduct) প্রণয়ন করতে হবে।

২১. সকল কারখানায় 'জেন্ডার কোড অব কনডাক্ট' নিশ্চিত করতে হবে।

২২. কারখানার সঠিক কর্ম-পরিবেশ, নিরাপত্তা ও শ্রম অধিকার নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক যে বাধ্যবাধকতার রয়েছে সে অনুসারে বায়ারদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

২৩. তৈরি পোশাক কারখানায় দুর্ঘটনা পরবর্তী সময়ে সরকারের ত্রাণ তহবিলে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ও তা ব্যয়ের তথ্য এবং দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তা জনসমক্ষে প্রকাশ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ করতে হবে।

২৪. রানা প্লাজা পরবর্তী সময়ে তৈরি পোশাক খাতে শ্রমিকদের নিরাপত্তা, কর্ম-পরিবেশ ও অধিকার সংক্রান্ত গৃহীত উদ্যোগ ও সহায়তা কর্মসূচি একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনায় নিয়ে আসতে হবে এবং সমন্বয় ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া তদারকির জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।

২৫. তৈরি পোশাক খাতে কর্ম-পরিবেশ ও শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিত করণে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ সমূহে নাগরিক সমাজের সংশ্লিষ্টতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

****

তথ্যসূত্রঃ

আকতার, ম, (২০০৭), *'রাজউক-এর নকশা অনুমোদন প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি'*, টিআইবি, ঢাকা।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন, অষ্টম জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, সেপ্টেম্বর ২০০৬।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ২য় প্রতিবেদন, নবম জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, নভেম্বর ২০১২।

বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১০-২০১১, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯।

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯।

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯।

বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩ ।

ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬।

ঢাকা মহানগর ইমরাত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৮।

ভবন নির্মাণ আইন, ১৯৫২ (The Building constriction Act, 1952)

Absar, S (2001), *"Problems surrounding wages: the readymade garments sector in Bangladesh",* Journal Labour and Management in Development, Volume 2, No 7.

Ahmed, Nehal Md and Hossain, Md. Sakhawat (2006), "*Future Prospect of Bangladesh's Ready-Made Garments Industry and the Supportive Policy Regime,"* Policy Note Series: PN 0702, Policy Analysis Unit (PAU), Research Department, Bangladesh Bank, Dhaka, Bangladesh

Ahmed, F (2011), *Working conditions in the Bangladesh Readymade Garments Industry, Is Social Compliance making a difference?* PhD. Thesis, LaTrobe University, Australia.

Bazlul, H khandakar and Nazneen Ahmed (2006), "*Exports, Employment and Working conditions: Emerging Issues in the Post-MFA RMG Industry".*

Bhattacharaya D. and Rahman, M.,(1999), "*Female employment under export propelled industrialization: Prospects for internalizing gloal opportunities in the Bangladesh apparel sector",* UNRISD Occasional paper No. 10, UNRISD, Geneva.

CARE (2012), *Baseline KAP Study on Garment Workers*, Dhaka.

David, Harvey (2005), *A Brief History of Neoliberalism*, Oxford University Press, pp. 160-65.

DFID (2004), *Labour Standards and Poverty Reduction*, London, UK, May, 2004.

Fauzia A (2006), "*The Rise of the Bangladesh Garment Industry, Globalization, Women workers and voice",* NWSA Journal, vol 16, no 2, summer, National Women studies Association, The JohnsHopkins University press.

Future of Bangladesh apparel Industry, FinancialExprss, 8th July, 2012

Labor Code (law no 10/2012/QH13), Socialist Republic of Vietnam.

Haque, A. (2001), "*A Study of Labour Market condition on the Bangladesh Readymade Garment Industry".*

Hoq, M (2004), "*Knitwear Industry in Bangladesh: An untold Story",* Explore the Galore of Bangladesh Knitwear Exhibition, Dhaka, BKME.

Humphrey, John, and Schmitz, Hubert (2005), *"Governance in Global Value Chains."* in Local Enterprises in the Global Economy: Issues of Governance and Upgrading, Hubert Schmitz Cheltenham (ed.,), Edward Elgar.

Hye, MA (1992) '*Trade Unionism, Wages and Lobour Productivity in the Manufacturing Sector of Bangladesh;* BIDS Research Report N.133, Bangladesh Institute of Development Studies, Dhaka

ICFTU (2006) "*Internationally Recognized Core Labour Standards in Bangladesh"*, Report for the WTO General Council Review of the Trade Policies of Bangladesh, Geneva, Switzerland.

International Labour Organization, ILO (2005) Rules of the Game: A brief Introduction to International Labour Standards, Geneva, Switzerland.

Kabeer, N and Mahmud, S (2004), "*Rags, Riches and Women Workers: Export-oriented Garment Manufacturing in Bangladesh",* Chains of Fortune: Linking Women Producers and workers with Global Markets, *pg 134-13.*

Khan F.R (2006), *"Compliance: Need of the hour in the apparel industry; law and our right",* issue No. 249, August.

Khan, S.I., (2001), *Trade Unions, Gender Issues and the Ready Made Industry of Bangladesh,* Report of the United Nations Research Institute for Social Development, Geneva.

Libcom (2006), "*Garment workers revolt in Bangladesh"*, www.libcom.org

Mckensey & Company (2011), Bangladesh Readymade Garments landscape: challenge and Growth, CPO survey, 2011.

Mahmud, RB (2012), "*Skills development in Bangladesh RMG sector",* The News Today, http://www.newstoday.com.bd

Mahmud, S (2009), "*Why do garments workers in Bangladesh fail to mobilize*?", Bangladesh Institute of Development Studies, Dhaka.

Majumder P.P and Begum.A (2000), "The Gender Imbalances in the Export Oriented Garments Industry in Bangladesh." *Policy Research Report on Gender and Development, Working Paper Series No 12*, The World Bank Development Research Group/ Poverty Reduction and Economic Management Network.

McConnell, Compbell R and Brue, Staneley I (2000), *Contemporary Labour Economics,* Second Edition, Singapore, McGrow –Hill Book CO.

Monjur, M (2007), *"A study on labour rights implementation in readymade garment (RMG) industry in Bangladesh: Bridging the gap between theory and practice",* University of Wolongong.

Mondol, AH (2002), *Globalization, Industrial Relation and Labour Policies : The Need for Renewed Agenda,* chapter 5 in Muqtab, M, et al.(eds) *Bangladesh Economic and Social Challenges of Globalization*, study prepared for the ILO Geneva, UPL, Dhaka

Morshed.M (2007) "*A Study on labour rights implementation in readymade garment (RMG) industry in Bangladesh: Bridging the gap between theory and practice"* University of Wollongong Theses Collection.

Quddus, M (*2000), Bureacratic Corruption and Bussiness Ethics: The Case of the Garment Export from Bangladesh, Chicago, March 1-3,*

Quddus, Munir and Salim Rashid, 2000 *"Entrepreneurs and Economic Development: The Remarkable Story of Garment Export from Bangladesh", Dhaka: The University Press Limited.*

Rabinowitz, Gideon (2006) "*Export competitiveness and Poverty Reduction: Complementary or Competing Objectiveness? Evidence from the Clothing Sector in Bangladesh, Cambodia and Srilanka*," CUTS International, United Kingdom

Rahman, M.M, Khanam and R.Nur.U.A (1999), *"Child Labor in Bangladesh: A Critical Appraisal of Harkins Bill and the MOU-Type Schooling Program*", Journal of Economic Issues, Vol.33.

Rasid, M (2006), "*Rise of readymade garments Industry in Bangladesh: Entrepreneurial ingenuity or Public Policy",* page-3, workshop on Governance and Development organized by the World Bank and BIDS, Dhaka, 11-12 November.

Soeb Md. S. Noman (2013), "*Determination of Minimum Wage for Garments Worker in Bangladesh Ensuring Firms Profitability"*, International Journal of Economics, Finance and Management, VOL. 2, NO. 3, May.

Sohag, KH (2013), "*Urbanization and Governance, Town Planing Perspective"*, AHDPH, Dhaka.

Taher, MA. (1999), "*Politization of Trade Union; Issues and Challenges in Bangladesh Perspective",* Indian Journal of Industrial Relation 34(4): 403-20

Tamanna, U (2010), "*Labour Unrest in Bangladesh RMG Sector: Does Active Labour Union Reduce the Risk of Labor Unrest in RMG Sector?",* Masters Thsis, Institute of Governance Studies BRAC University, Dhaka.

World Bank (2002), "Bangladesh Growth and Export Competitiveness", Report No. 31394-BD, Poverty Reduction and Economic Management Sector Unit, South Asia Region.

1 CLR (2013), The Counsel Law Reports, April 2013, volume 1, Issue 4.

www.webcache.googleusercontent.com

http://www.bgmea.com.bd/

www.bgmea.com.bd

www.bkmea.com

www.bils-bd.org/

www.epb.gov.bd

www.fireservice.gov.bd

www.ilo.org/dhaka

www.mof.gov.bd

www.mole.gov.bd

www.rajukdhaka.gov.bd

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

হক, রুবানা ও আনিসুল হক (২০১৩), 'সংকট উত্তরণে কিছু প্রস্তাব', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০ মে।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬।

জাতীয় শিল্প নীতি, ২০১০।

জাতীয় শ্রম নীতি, ২০১২।

BGME (2012), Bizbangladesh.com

Ahamed, F (2013), *"Could monitoring and surveillance be useful to establish social compliance in the readymade garment (RMG) industry of Bangladesh?",* International Journal of Management and Bussiness Studies, 10th January.

Bhuiyan.Z.A (2012), *"Present Status of Garment Workers in Bangladesh: An analysis".* IOSR Journal of Bussiness and Management (IOSRJBM), ISSN: 2278-487X Volume.3 Issue 5, PP 38-44.

Dina M. Siddiqi (2009), "*Do Bangladeshi factory workers need saving? Sisterhood in the post-sweatshop era",* Feminist Review, Vol. 91, 0141-7789/09, pp.154–174, www.feminist-review.com

……, (2003), "*The Sexual Harassment of Industrial Workers: Strategies for Intervention in the Workplace and Beyond"*, paper no 25, Centre for Policy Dialogue (CPD) & UNFPA, June.

Dasgupta, S (2002), *"Attitude towards Trade Union in Bangladesh*, *Brazil, Hungary and Tanzabua*." Journal on International Labour Review, Vol.14 (1).

Huq, A (2013), *'Made in Bangladesh: Crumching numbers'*, The Daily Star, Dhaka, June 22.

Huq, A & Rubana Huq (2013), *'Letter from a Bangladesh Factory'*, The Wall Streat Journal, May 15.

ILO (2013), Global Wage Report 2012-13, Wages and equitable growth, The International Labour Organization (ILO), Geneva

JIM YARDLEY (2013), After Disaster, Bangladesh Lags in Policing Its Maze of Factories, at http://www.nytimes.com on July 2, 2013.

Kenta, Goto (2012), "*Is the Vietnam Garment Industry at a turning point ? Upgrading from the export to the Domestic Maket",* IDE Jetro.

Majumder, PP and Kawser Ahmed, "National Study of the Gaps in Laws and Practice of Freedom of Association and collective bargaining Rights in the Export Processing Sector in Bangladesh", ILO and SIDA

Muhammad. A, (2012), "*RMG in Bangladesh: Growth of Industry and Deprivation of workers"*, 12th December, available www.meghbarta.info.

Mottaleb, M and Sonobe, T (2009), "*An Inquiry into the Rapid Growth of the Garment Industry in Bangladesh,"* Economics working paper, National Institute for Policy Studies, August.

Lal Mohan Baral, *"Comparative Study of Compliant & Non- Compliant RMG Factories in Bangladesh"*, International Journal of Engineering & Technology IJET-IJENS Vol:10 No:02

Rhee, yung W (1990), "*The Catalyst Model of Development: Lesson from Bangladesh's Success with Garment Export",* World Development vol. 18, no.2

Saxena, Sanchita B. and Wiebe, Frank (2005), "*The Phase of the Multi-fiber Agreement: Policy Options and Opportunities for Asia",* San Francisco, The Asia Foundation.

Siddiq, Hafiz G.A (2005), *The Readymade Garment Industry of Bangladesh*, Dhaka, UPL.

UNHCR (2012), *"Annual Survey of Violations of Trade Union Rights-Bangladesh"*, 6th June.

পরিশিষ্ট-১:

ভিয়েতনাম শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম আইন এর তুলনামূলক পর্যালোচনা

তৈরি পোশাক খাত রপ্তানি কারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পর ভিয়েতনামের অবস্থান। ভিয়েতনামে দ্রুত সম্প্রসারিত এ খাতে ২.৫ মিলিয়ন কর্মরত শ্রমিক কর্মরত রয়েছে। ২০১২ অর্থবছরে মোট ১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে।[৯৯] 'ভিয়েতনাম লেবার কোড'[১০০] (পরবর্তীতে ভিয়েতনাম শ্রম আইন বলে উল্লেখিত) শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক ভবে অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এ আইন প্রণয়নে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল এবং আইনটিকে একটি মডেল আইন হিসেবে অনেক ক্ষেত্রে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। এ প্রেক্ষিতে নিম্নে 'ভিয়েতনাম লেবার কোড' এবং বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর তুলনা মূলক পর্যালোচনা করা হলো-

- ভিয়েতনাম শ্রম আইন (ধারা ৪৪) এ শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে যৌথ দরকষাকষি চুক্তি (CBA: Collective Bargaining Agreement) বাধ্যবাধকতামূলক ভাবে সম্পাদন করতে হয়, যা পরবর্তীতে যে কোন দ্বিপাক্ষিক আলোচনার অনুসরণ করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশ শ্রম আইনে এ সম্পর্কে কোন বাধ্যবাধকতার বিধান রাখা হয়নি।
- ভিয়েতনামে কোন কারখানার কার্যক্রম শুরু হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে অস্থায়ী ট্রেড ইউনিয়ন গঠন এবং ১২ মাসের মধ্যে স্থায়ী করার কথা বলা হয়েছে। এ বিধান কার্যকর করার দায়িত্ব আঞ্চলিক অথবা ইন্ডাস্ট্রি ফেডারেশন অফ লেবার এর ওপর দেওয়া হয়েছে (ধারা ১৫৩)। এছাড়া, ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির জন্য মালিকদের বাধ্যবাধকতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ শ্রম আইনে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠায় কোন বাধ্যবাধকতার বিধান নাই। অপরদিকে, বাংলাদেশ শ্রম আইনে ট্রেড ইউনিয়ন কি কি করতে পারবে না সে সম্পর্কে বলা হলেও ট্রেড ইউনিয়ন এর নির্দিষ্ট করণীয় কার্যাবলী সুনির্দিষ্ট করা হয় নি। বিপরীতে, ভিয়েতনাম শ্রম আইনে [ধারা ১৫৫ এবং ১৭৪(ঘ)] সুনির্দিষ্টকরা হয়েছে।
- বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩ অনুযায়ী একটি কারখানায় অনাধিক ৩টি ট্রেড ইউনিয়ন [ধারা ১৭৯(৫)] এবং ন্যূনতম ৩০% সদস্য অংশগ্রহণের মাধ্যমে [ধারা ১৭৮ (২)] ইউনিয়ন গঠনের কথা বলা হয়েছে। যেখানে ভিয়েতনামে একটি কারখানায় একটি ট্রেড ইউনিয়ন এবং অস্থায়ী ট্রেড ইউনিয়নে নির্বাহী কমিটি ব্যতিত ন্যূনতম ৫ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠন করার বিধান রাখা হয়েছে। বিরোধ নিস্পত্তির ক্ষেত্রে ভিয়েতনাম শ্রম আইনে (ধারা ১৫৭) ব্যক্তিগত এবং যৌথ দু'ধরনের বিরোধ নিস্পত্তির কথা বলা হয়েছে এবং ব্যক্তিগত বিরোধের ক্ষেত্রে ধর্মঘট কর্মসূচি পালন না করার বিধান রয়েছে (ধারা ১৭২)। বিপরীত দিকে বাংলাদেশ শ্রম আইনে বিরোধ নিস্পত্তি ও শিল্প সম্পর্ক কথা বলা হলে তা বিভাজন করা হয়নি।
- ভিয়েতনাম শ্রম আইনে কারখানার পরিবেশ এবং কর্মীদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য প্রতি ৩ মাস অন্তর মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে Dialogue at Workplace নামক আলোচনা সভার বাধ্যবাধকতা রাখা হয়েছে (ধারা ৬৫)। কিন্তু বাংলাদেশ শ্রম আইনে শ্রমিক প্রতিনিধি ও মালিকের সাহায্যে 'অংশগ্রহণকারী কমিটি' গঠনের বিধান রয়েছে, তবে সভা অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করা হয়নি।
- ট্রেড ইউনিয়ন ফি এর ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন মেম্বারদের অংশগ্রহণ এবং তা উচ্চ ফেডারেশনে কতটুকু প্রদানের করতে হবে তা বাংলাদেশ শ্রম আইনে বলা হলেও ট্রেড ইউনিয়ন বাজেট সম্পর্কে কোন ধারণা দেওয়া হয় নি। বিপরীতে, ভিয়েতনাম শ্রম আইনে বিভিন্ন সার্কুলারের মাধ্যমে মালিক এবং সাধারণ শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন বাজেটে অংশগ্রহণ করার নিয়ম তৈরি করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে, যদি ট্রেড ইউনিয়নভুক্ত কর্মীর চাকুরির মেয়াদকাল শেষ হয়ে যায় কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন এর মেয়াদকাল থাকে তাহলে তার চাকুরির মেয়াদ কাল ঐ সময় পর্যন্ত বর্ধিত করার নিয়ম রাখা হয়েছে, যা বাংলাদেশ শ্রম আইনে অনুপস্থিত।
- ভিয়েতনাম শ্রম আইন (ধারা ৭৩) অনুযায়ী যদি কোন উৎসব ছুটি সাধারণ ছুটির দিনে পর্যবসিত হয় তাহলে তা পরবর্তী দিনে পালন করার বিধান রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইনে সে সুযোগ প্রদান করা হয় নি।
- শ্রমিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সামাজিক বিমা, বেকারত্ব বিমা এবং স্বাস্থ্য বিমা- এ তিন প্রকার বিমা প্রাপ্তি 'ভিয়েতনাম সোশ্যাল ইন্সুরেন্স ল' (ধারা ১৮, ৯২) এর মাধ্যমে সুস্পস্টভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে, যা বাংলাদেশ শ্রম আইনে সুস্পষ্ট করা হয় নি।

[৯৯] VTAS (2013), Vietnam Textile & Apparel Association, Hanai, www.gotoadmin.amchamvietnam.com
[১০০] Labor Code (law no 10/2012/QH13), Socialist Republic of Vietnam.

- বাংলাদেশ শ্রম আইনে মজুরি পরিশোধের ক্ষেত্রে ৩০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ৭ কার্য দিবসে তা পরিশোধের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তা লঙ্ঘিত হলে মালিকের ক্ষেত্রে কি করণীয় তা পরিষ্কার করা হয় নি। কিন্তু ভিয়েতনাম শ্রম আইনে (ধারা ৫৮) পরিষ্কার করে বলা হয়েছে- এ ক্ষেত্রে মালিক জাতীয় ব্যাংক নীতি অনুযায়ী ঐ সময়ের জন্য যে সুদ হবে তা দিতে বাধ্য থাকবে।
- বেতন কাঠামোর ক্ষেত্রে ভিয়েতনাম শ্রম আইনে দেশীয় কারখানার জন্য ৪টি অঞ্চল ভিত্তিক শ্রম কাঠামো এবং বিদেশি বিনিয়োগকৃত কারখানার জন্য আলাদা বেতন কাঠামোর বিধান রাখা হয়েছে, বাংলাদেশ শ্রম আইনে জাতীয়ভাবে খাত ভিত্তিক বেতন কাঠামো নির্ধারণের বিধান রয়েছে।
- ভিয়েতনাম শ্রম আইনে শুধুমাত্র কারখানার কোন যন্ত্রপাতির ক্ষতি সাধন ছাড়া মালিক কর্তৃক মজুরি কর্তনের অধিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশ শ্রম আইনে মালিক কর্তৃক বিভিন্নভাবে মজুরি কর্তনের অধিকার রাখা হয়েছে।
- বাংলাদেশ শ্রম আইনে 'অস্থায়ী শ্রমিক' ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়েছে। অপর দিকে ভিয়েতনাম শ্রম আইনে অস্থায়ী শ্রমিকদের বেতন ভাতা নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং তা ন্যূনতম মজুরির নিম্নে হবে না এর নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে।

###